প্রেতসিদ্ধের কাহিনী

ও অন্যান্য রচনা

সুবিমল রায়

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া, ১৩৫৮

প্রকাশক
শীলা ভট্টাচার্য
আশা প্রকাশনী
৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
শ্রীদিলীপকুমার দে
দে প্রিণ্টার্স
১৫৭বি, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০ ০০৬

ব্লক
এনগ্রেভকো
২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

ভূমিকা

এই বইখানি হল আমার নান্‌কুদার আজগুবি ভাবনার বই। নান্‌কুদার আসল নাম সুবিমল রায়। সে নাম অনেকেই জানেন না। আজগুবি কথার মানুষ, তাকে নান্‌কুদা বলে সবাই ডাকত। নান্‌কু মানে ছোট। আমার মেজ-জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোরের ছোট ছেলে নান্‌কুদা।

ভাবনা যার আজগুবি, সে মানুষটি কেমন ছিল? মাঝারি লম্বা, রোগা, ফরসা, মুখের গড়নটি সুন্দর, কিন্তু দাড়ি-গোঁফে অর্ধেকের বেশি ঢাকা। থেকে থেকে রোগে ভুগত। এদিকে ষণ্ডা পালোয়ান গামার মতো হবার শখ। ছোটবেলায় দেখতাম বাদাম ভেঙে খায়; আমাদেরো দিত। তাতে নাকি গায়ে জোর হয়। গায়ে জোর হয় কিনা জানি না, কিন্তু দরজার খাঁজে বাদাম ভাঙার ফলে দরজা বন্ধ হতে চাইত না আর নান্‌কুদার ঘোর অক্ষিদে। শেষে আমার মা বাদামগুলো কেড়ে নিলেন। এ ব্যাপার ঘটেছিল শিলং-এ; নান্‌কুদা সেবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছিল, বয়স হয়তো ১৬।

আমাদের বলত সর্বদা সাদা শিমুলের শেকড়ের সন্ধানে থাকতে। সাদা শিমুল ফুলের গাছের শেকড় খেলে, বুড়ো হয়ে যাদের দাঁত পড়ে গেছে, তাদের নাকি আবার দাঁত গজায়। দুঃখের বিষয় সারা জীবনেও সাদা শিমুলের সন্ধান পেলাম না। বোধহয় হয় না!

তাই বলে নান্‌কুদার সব ভাবনাই আজগুবি ছিল না, গভীর গম্ভীর দিক-ও একটা ছিল। এই বইতে তারো নমুনা আছে। ধর্মে নান্‌কুদার গভীর বিশ্বাস ছিল; সাধু-সঙ্গ ভালোবাসত; দুঃখীদের সেবা করত; কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য না করে ছাড়ত না। তাছাড়া প্রায় ষাট বছর ধরে আমার আর আমার ভাই বোনদের জীবন রঙে, রসে, রোমাঞ্চে ভরে রেখেছিল। সেই আমার পাঁচ বছর বয়সে যখন গল্প শোনার বুদ্ধি ফুটল, তখন থেকে শুরু করে, যতদিন না রোগে ওর নিজের চলা-ফেরা বন্ধ হল, ততদিন পর্যন্ত।

গোমুখে যেমন পাথরের তলা থেকে গলগল করে অবিরাম ধারায় গঙ্গা বেরিয়ে আসে, তেমনি ওর দাড়ি-ওয়ালা গম্ভীর মুখ থেকেও অনর্গল ধারায় গল্প বেরিয়ে আসত। সে-সব গল্পের বেশির ভাগই প্রকাশ করা যায় না, কারণ সত্যিকার গপ্পেদের যেমন হওয়া উচিত, গল্প বলার সময় নান্‌কুদার স্থান-কাল-পাত্র, লঘু-গুরু, সত্য-মিথ্যা কোনো জ্ঞানই থাকত না। বড়দের দিয়ে যে এমন অভাবনীয় রকম মজার কাণ্ড ঘটানো যেতে পারে, সে-কথা নানকুদার মুখে না শুনলে, বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। একটি বাদে আর কোনো নিয়ম মানত না নান্‌কুদা, আমাদেরো

পরেও তাঁদের কাছে রিপোর্ট করা হবে না। নিজে যে আমাদের চাইতে ১১-১২ বছরের বড় সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। গপ্পের আবার বয়স কিসের ?

সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মুখে নানকুদা লাল-নীল রঙ মাখিয়ে দিত। নিজের মনের রঙ-তুলি ছাড়া অন্য কোনো সরঞ্জামের সাহায্য নিত না। শুনতে শুনতে আমাদের কান খুলে গেছিল, প্রাণ খুলে গেছিল। টের পেতে লাগলাম জীবনটা কি আশ্চর্য এবং অমূল্য। পৃথিবীর সব জায়গা কিরকম বেজায় উপভোগ্য, সব মানুষ কি অসম্ভব মজার। সব দৃশ্য কি অপূর্ব, সব খাবার কি দারুণ ভালো। এখানে বলে রাখা উচিত নান্‌কুদার মনের ভাব প্রকাশ করার পক্ষে সাধারণ অভিধানে কুলোত না। তাই নতুন নতুন শব্দের আবিষ্কার, আহরণ ও কিঞ্চিৎ বাঁকাচোরা-করণ দরকার হত। যেমন 'কিউল' হল সুন্দরী কন্যা, 'স্ট্রাক' হল আকৃষ্ট, 'হিঁক' হল দস্তুরমতো প্রেমাসক্ত। চমৎকার দৃশ্য হল 'অক্ষট' দৃশ্য, দেখতে ভালোরা সব 'দীপ্যমান'।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল নান্‌কুদার। কোনো জিনিস ওর চোখ এড়িয়ে যেত না, কিছুকেও অকিঞ্চিৎকর মনে করত না। কোথায় কোন গোরু দেখে এসেছে, তার গায়ের রঙ হলদে। ড্যালহৌসি স্কোয়ারে একটা লুকোনো চোঙা থেকে ভক্-ভক্ করে ধোঁয়া বেরোয়। যা দেখত মনের মধ্যে জমা করে রাখত, তখনি কোনো মন্তব্য না করলেও ডাইরিতে লিখে রাখত। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে লাল, নীল, সবুজ কালি ব্যবহার করা হত। অনেক বছর পরে অদ্ভুত চেহারা নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। আমাদের দুর্বলতাগুলো সং সেজে ঠ্যাং তুলে চোখের সামনে নেচে বেড়াত। কিছু বলার উপায় থাকত না। এইসব গল্প আমরা জনা ১০-১২ ছাড়া, কেউ শুনেছিল কি না জানি না। আমরাও লিখে রাখি নি। ষাট বছরের গল্প কখনো লিখে রাখা যায় ? তাছাড়া বেশির ভাগই লিখে রাখার মতো নয়। বেজায় ভালো, কিন্তু উহ্য থাকাই উচিত। একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম। যাদের ও ভয়ঙ্কর ভালোবাসত তাদের সর্বদা বাদ দিত। ওর নিজের মা-বাবা, আমার মা, বড়দা। তাই বলে আমার বাবা কি অন্য জ্যাঠাদের ছাড়ত না। ও-গল্প লিখে রাখা না গেলেও, তাই দিয়ে জীবনব্যাপী একটা রসের আবহাওয়া তৈরি করা যায়। এতটুকু ক্লেশ থাকত না কোথাও, শুধু নির্মল মজা। শাস্ত্রে নয়রকম রসের নাম আছে ; তার সবগুলোই উপভোগ্য। তবে উপভোগ করতে জানা চাই। নান্‌কুদার কাছে এই সত্যটি শিখেছিলাম।

নানকুদা কেমন করে ভূতের গল্প উপভোগ করত সে এক দেখবার জিনিস ছিল। আমরা তখন পদ্মপুকুরের এক নির্জন গলিতে, একটা ছোট্ট মাঠের সামনে, একটা দোতলা ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। রাত দশটায় চারদিক নিঝুম হয়ে যেত। নান্‌কুদা সেদিন এড্‌গার অ্যালান পো-র টেল্‌স্ অফ্ হরর্ পড়বে। নিজে পড়বে, আমাদের শোনাবে না। রাত ন-টা থেকে তার তোড়-জোড় হতে লাগল। তাড়া

দিয়ে চাকরদের খাওয়াদাওয়া, রান্নাঘর ধোয়ার পাট চুকিয়ে, তাদের তিনতলার ঘরে পাঠানো হল।

তারপর একতলার সব আলো নিবিয়ে, একটিমাত্র মোমবাতি জ্বেলে, ঐ হরিবল্ বই পড়তে বসল। দেয়ালে নিজের ছায়া নড়তে লাগল; মনে হল চেয়ার-টেবিল-আলমারি সব কেমন বেঁকে বেঁকে ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছে; বাইরে ঘোড়া-নিম গাছে অদ্ভুত একটা শিঁ-শিঁ শব্দ হতে আরম্ভ করল আর নানকুদা রাত দেড়টা অবধি ঐ বই পড়ে, ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিবিয়ে, অন্ধকারে একা ঘরে শুয়ে পড়ল। ভূতের গল্প নাকি ঐভাবে উপভোগ করতে হয়। চমৎকার গা শির-শির করে, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়, চুলের গোড়া চিন্‌চিন্ করে।

রসের সাগর ছিল নান্‌কুদা। তার এক হাজার ভাগের এক ভাগ-ও নেই এই বইতে। নিজের আবহাওয়া নিজে তৈরি করে তার মধ্যে বসে থাকত। সংসারের ওঠা-পড়ায় ওর কিছু এসে যেত না। দুঃখ-কষ্টকে কেয়ার করত না। অথচ ছোটবেলা থেকে সুখে আরামে মানুষ। দেশে জমিদারি ছিল, কলকাতায় এতবড় ব্যবসা, টাকাকড়ি রোজগার করার কথা কোনোদিনও সে চিন্তা করে নি। সিটি স্কুল, সিটি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ইতিহাসে এম্-এ পাশ করে তবে থামল। ততদিনে ওর বাবা চোখ বুজেছেন, আগেকার সে অবস্থা পড়তে শুরু করেছে। কয়েক বছরের মধ্যে দাদাও গেলেন। ব্যবসা রাখা, বাড়ি রাখা দায় হয়ে উঠল। মায়ের কি কষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে নান্‌কুদা প্রথমে কেশব অ্যাকাডেমিতে ও পরে সিটি স্কুলে মাস্টারিতে ঢুকে গেল। এবং অবসর নেওয়া পর্যন্ত সেখানেই থেকে গেল।

মাস্টারি করা অনেকের কাছে খুব ক্লেশকর, কিন্তু নান্‌কুদা তা-ও উপভোগ করত। মনে হত অসুবিধা কষ্ট কেমন করে উপভোগ করতে হয় ও জানত। ছাত্ররা ওর আরেকটা দিক-ও দেখতে পেত। এই সহৃদয় ভালোমানুষ মাস্টার মশাইটি গরীব ছেলেদের বই কিনে দেন, মাইনে দিয়ে দেন, এটা তারা হামেশাই দেখত। বেশিরভাগ ছেলে তাঁকে শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত। দুর্দান্ত কয়েকজন ছিল; তারা নিজেদের সুবিধা করে নিতে গিয়ে দাড়িওয়ালা রোগা ফরসা অমায়িক মাস্টারমশায়ের এলেমখানা কত তা টের পেয়েছিল।

একবার ক্লাসে তাদের কয়েকজন মহা গণ্ডগোল আরম্ভ করল, কিছুতেই আর কথা শোনে না। বিশেষ করে একজন ভারি অসভ্যতা করতে লাগল। সে বলে কি না, "আপনি আমার কি করতে পারেন?"

ভালোমানুষ মাস্টারমশাই তখন এগিয়ে এসে বললেন, "এই করতে পারি!" বলে ডান হাতে বাঁ গালে প্রচণ্ড এক চড় মেরে মুখটা ডান দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। তারপর বাঁ হাতে ডান গালে আরেকটা চড় মেরে মুখটা আবার সোজা করে দিয়ে বললেন, "একে আমি মার বলি না। এটা শুধু মারের নমুনা।" আর কখনো ক্লাসে কেউ অসভ্যতা করে নি। আসলে নান্‌কুদাকে দেখে যতটা দুর্বল মনে হত,

মোটেই তা ছিল না। আর মনের দিক থেকে তো নয়ই। দুঃখ হতাশাকে সে এতটুকু আমল দিত না। যেখানে যখন থাকত সেখানকার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে সুখেই থাকত। অথচ নিজের স্বকীয়তা এতটুকু খর্ব করত না। লোকের কথায় নানুকুদার সামান্যই এসে যেত।

অবশেষে সত্যি করে ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স উঠে গেল। গড়পারের শখের বাড়ি ওদের ছাড়তে হল। নানুকুদা আর তার মা আমাদের সেজ জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে চলে গেলেন। জ্যাঠাইমা এই শেষের দুঃখটা সইতে পারলেন না। দেখতে দেখতে তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল। আমার মা-বাবা গিয়ে নানুকুদা, মণিদাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলেন। মণিদা অল্পদিনের মধ্যেই ভালো কাজ পেয়ে নিজে বাড়ি ভাড়া করে উঠে গেলেন। নানুকুদা আমার মায়ের কাছে থেকে গেল। মাকে সে বড় ভালোবাসত। জন্মে অবধি ভালোবাসত। মা যতদিন ছিলেন, নানুকুদা তাঁকে ছেড়ে যায় নি। সুখে দুঃখে সে আমাদের দীর্ঘদিনের নিত্য সাথী ছিল।

শেষ বয়সে নানান্ রোগে ভুগে নানুকুদার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। সেই সময়টা তার বড়দার ছেলে সত্যজিতের বাড়িতে তাদের আদর যত্নে কেটেছিল। শরীরের ক্রমে অবনতি হওয়ায়, পরে তাকে হাসপাতালে ভরতি করতে হয়েছিল। প্রায় ৭৭ বছর বয়সে নানুকুদার মৃত্যু হয়। তার জীবন ফুরোলেও আমাদের জন্য যে রসের সম্ভার রেখে গেছে, সে ফুরিয়ে যাবার নয়। এই বইতে তারি খানিকটা নমুনা পাওয়া যাবে।

শেষের দিকে নানুকুদা একজন মহাপুরুষের জীবনী লিখতে ব্যস্ত ছিল। গল্প লেখা ইত্যাদিতে আর হাত দিতে চাইত না। সারাজীবন তার মনের এই দিকটাকে সে যত্ন করে আলাদা করে রেখেছিল। যাকে-তাকে বলত না, তবে কোনো গোপনীয়তাও অবলম্বন করত না। তিব্বতীবাবাকে নানুকুদা ভারি শ্রদ্ধা করত, তাঁর আশ্রমে গিয়ে মাঝে মাঝে থাকত। তাঁর কাছ থেকে সে যে সত্যিই আধ্যাত্মিক কিছু পেত, সে-কথা সে নিজেই বলত। অন্য শিষ্যরা তাকে শ্রদ্ধা করতেন ও ভালোবাসতেন। তবে আমাদের সঙ্গে এ-সব বিষয়ে বেশি কিছু বলত না।

আশ্চর্য মানুষ ছিল নানুকুদা। এই দৃশ্যমান জগতের মধ্যিখানে সে রঙে রসে ভরা আরেকটা জগতের সন্ধান পেয়েছিল, তারি মধ্যে বাস করত। সুখের বিষয়, তার দরজাটা সর্বদা খোলা রাখত। এই গল্পগুলি পড়ে যদি রচয়িতার মনের ভাব একটুও উপলব্ধি করা যায়, তবেই বইখানি প্রকাশ করা সার্থক হয়।

লীলা মজুমদার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সুবিমল রায়ের 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত লেখাগুলো নিয়ে প্রকাশিত হল 'প্রেতসিদ্ধের কাহিনী ও অন্যান্য রচনা'। বই-এর নামকরণ, অধ্যায় বিন্যাস করে দিয়েছেন শ্রীসত্যজিৎ রায়। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রীপার্থ বসুর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং শ্রীসুবীর ভট্টাচার্যের সহযোগিতা ব্যতীত বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন শ্রীলীলা মজুমদার, পুরনো 'সন্দেশ' থেকে লেখা কপি করবার বন্দোবস্ত করে, সুবিমল রায়-এর আলোকচিত্র এবং পাঁচটি ব্লক ব্যবহার করতে দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীনলিনী দাশ। উপেন্দ্রকিশোর রায় ও সুকুমার রায়ের আলোকচিত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছেন শ্রীশিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল। শ্রীসন্দীপ রায় এবং শ্রীনিখিল সরকার (শ্রীপান্থ)-এর সহযোগিতার কথাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। শ্রীদিলীপ দে বইটি যত্ন করে ছেপে দিয়ে সাহায্য করেছেন।

বিনীত

শীলা ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

বমল বায

উপেন্দ্রকিশোর রায়

সুকুমার রায়

প্রেতসিদ্ধের কাহিনী

কলিকাতার দর্মাহাটা স্ট্রিটে বলরাম ময়রার মিঠাই-এর দোকান। বলরামের সরভাজা আর রাবড়ি এককালে বিখ্যাত ছিল। দোকানের সামনে বড় বড় অক্ষরে লেখা—

বলরাম মোদকের
বিখ্যাত মিষ্টান্ন এখানে পাইবেন

দোকান থেকে প্রায় ৩০ হাত দূরে এক গাছতলায় একজন বুড়া ভিখারী বসিয়া থাকিত। তাহার এক পা একটু খোঁড়া, মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি, নাকের ডগায় সাদা দাগ, বোধ হয় শ্বেতী বা ধবল রোগ হইয়াছিল। তাহার চোখ দুটি বড়ই তীব্র, অন্ধকারে বিড়ালের চোখের মত জ্বলিত। ভিখারী মন্দ লোক ছিল না, কিন্তু পাড়ার ছেলেদের কাছে তাহার একটা বড় বদনাম ছিল—সে নাকি পিশাচসিদ্ধ ছিল, অর্থাৎ ভূতপ্রেতের সঙ্গে কারবার করিত। বোধ হয় ভিখারীর অদ্ভুত চেহারা দেখিয়া ছেলেরা ভয় পাইত। তাহার দুর্নামের আর একটি কারণ ছিল তাহার সঙ্গের কুকুরটি। ভিখারীর সঙ্গে সর্বদাই একটি প্রকাণ্ড কুকুর থাকিত। ভিখারীর চেহারার সঙ্গে কুকুরের চেহারার কেমন একটা সাদৃশ্য ছিল। কুকুরটিরও এক পা একটু খোঁড়া, নাকের ডগায় সাদা দাগ, চোখ দুটি খুব উজ্জ্বল, দাড়ি ছিল না বটে, কিন্তু পায়ের লোমের তুলনায় চোয়ালের লোম অনেক লম্বা ছিল।

বলরাম ময়রা প্রতিদিন ভিখারীকে কিছু মিঠাই দিত। ভিখারী নিজে খাইয়া বাকি খাবার কুকুরটিকে দিত, কুকুরটি খুব তৃপ্তির সহিত উহা খাইত। লোকে বলিত যে কুকুরটি কতদিন ধরিয়া ভিখারীর সঙ্গে আছে তাহা কেহই জানে না। কেহ কেহ বলিত যে ভিখারী তাহার প্রেতসিদ্ধ গুরুর কাছে ঐ কুকুর পাইয়াছিল।

রাত্রে বলরামের দোকান বন্ধ হইয়া গেলে ভিখারীও তাহার কুকুর লইয়া কোথায় চলিয়া যাইত। পরদিন সকালে আবার সেখানে ফিরিয়া আসিত। বলরামের দোকান ঘেঁষিয়া বদ্ধ গলি পূর্বদিকে চলিয়া গিয়াছে। এই গলিতে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মজুমদার থাকিতেন। তিনি একখানি একতলা বাড়িতে একা

থাকিতেন, একটা চাকর ঠিকা কাজ করিত। ভদ্রলোক নিজে কেরানীর কাজ করিতেন, কিন্তু সাধারণ কেরানীর মত শরীর তুর্বল ছিল না। পূর্ণবাবু গোঁয়ার গোবিন্দ মানুষ, খুব খাইতে পারেন, বয়স মাত্র ২৫ বৎসব, স্বাস্থ্য খুব ভালো। ভদ্রলোক নিজের গ্রামে পেটুক বলিয়া পবিচিত ছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া বলরামেব মিঠাই খাইয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন।

একদিন পূর্ণবাবু অফিস হইতে বাড়ি ফিরিয়া দেখেন বিড়ালে তুধ খাইয়া ফেলিয়াছে, আর ইঁতুরে জয়নগরের মোয়া খাইতেছে ও নানা ভাবে নষ্ট করিতেছে। ভদ্রলোক ছাতা দিয়া ইঁতুর মারিতে গেলেন, ইঁতুর মরিল না, লাভের মধ্যে একটা ভাঁড় ভাঙ্গিয়া গেল। পূর্ণবাবু ক্ষুধায় অস্থির হইয়া বলরামের দোকানে ছুটিলেন। ক্ষুধার সময় তাঁহার কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান থাকিত না।

বলরাম তখন কোথায় গিয়াছিল, বাহির হইতে দরজা ঠেলিয়া বন্ধ করিয়া গিয়াছে কিন্তু তালা লাগায় নাই। পূর্ণবাবু দরজা খুলিয়া ভিতরে গিয়া বসিলেন। পাঁচ মিনিট হইয়া গেল, তবু বলরাম ফিরিল না। পূর্ণবাবুর চারদিকে সরভাজা, রাবড়ি আর নানারকম মিষ্টি থরে থরে সাজান রহিয়াছে। তাঁহার ক্ষুধাও ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। হঠাৎ তাঁহার কি কুবুদ্ধি হইল, তিনি এক হাঁড়ি সরভাজা আর এক হাঁড়ি রাবড়ি তুলিয়া নিলেন। বাস্তায তখন লোক ছিল না, স্নুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত মনে দোকানের পাশেব গলি দিয়া নিজের বাড়ির দিকে রওনা হইলেন। হঠাৎ পিছন ফিরিয়া দেখেন, রাস্তার ধারে গাছতলায় বসিয়া সেই ভিখারী ও তাহার কুকুর কটমট করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে। তাহাদের সবুজ চোখ ক্রোধে ও ঘৃণায় জ্বলিতেছে।

মানুষ বা পশুর চোখে এমন তীব্র জ্বলন্ত ক্রোধ ও ঘৃণার ভাব তিনি আগে কখনও দেখেন নাই। মুহূর্তের জন্য পূর্ণবাবু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর হন হন করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। সেইদিনই তিনি অর্ধেক রাবড়ি খাইয়া ফেলিলেন। বাকি রাবড়ি ও সরভাজা পরদিনের জন্য রাখিয়া দিলেন। সেদিনের ঘটনার কথা তিনি অনেকক্ষণ ভাবিয়া দেখিলেন। ভিখারী যে তাঁহার সব কীর্তি দেখিয়া ফেলিয়াছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ রহিল না। তিনি ভাবিলেন, ভিখারী সব কথা বলরাম ময়রাকে বলিয়া দিবে।

পরদিন অফিসে যাইবার সময় তিনি দেখিলেন যে ভিখারী ও তাহার কুকুর সেই গাছতলায় বসিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে। কিন্তু বলরাম ময়রা নিজে পূর্ণবাবুকে যেরূপ ভাবে নমস্কার ও অভ্যর্থনা করিল তাহাতে তিনি বুঝিলেন যে,

বলরাম তাঁহাকে সন্দেহ করে না, ভিখারী তাহাকে কিছুই বলে নাই। ইহাতে তিনি মনে মনে খুশি হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার বিষম ধাঁধা লাগিয়া গেল। ভিখারীর চোখমুখের ভাব দেখিয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তাহার রাগ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। তব্‌ সে বলরামকে কিছু বলিয়া দিতেছে না কেন? সে শুধু ঐরূপ ভয়ঙ্কর ভাবে কটমট করিয়া থাকে কেন?

সেদিন পূর্ণবাবুর সামান্য মাথা ধরিয়াছিল, তাই তিনি অফিসের পর গড়ের মাঠে বেড়াইতে গেলেন। সেখান থেকে ইডেন গার্ডেনে গিয়া একটি বেঞ্চে বসিয়া ব্যাণ্ড শুনিতে লাগিলেন। বাজনা শুনিতে শুনিতে আর বাগানের ঠাণ্ডা বাতাস খাইতে খাইতে তাঁহার মনে স্ফূর্তি আসিল, মাথা ধরা সারিয়া গেল। সামনে ঘাসের উপর ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটাছুটি করিতেছে, পূর্ণবাবু দেখিতেছেন। একটি ছোট ছেলে একটা ক্রিকেট বল গড়াইয়া দিল। বলটি গড়াইয়া গড়াইয়া যাইতেছে, আর একটি মোটা মাড়োয়ারী ভদ্রলোক অসাবধান হইয়া সেই বল মাড়াইয়া দিলেন আর তখনই চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া পূর্ণবাবু হাসিয়া ফেলিলেন।

সন্ধ্যার পর ব্যাণ্ড থামিয়া গেল, আর পূর্ণবাবু ইডেন গার্ডেনের নির্জন নিরিবিলি বাঁকাচোরা রাস্তা দিয়া আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে রওনা হইলেন। চারিদিকে নানারকম গাছপালা, তাহার ভিতর দিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া রাস্তা গিয়াছে। পূর্ণবাবু চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা ঝোপের সামনে থামিয়া দাঁড়াইলেন, ঝোপের ভিতর হইতে একখানা অতি কদাকার মুখ উঁকি মারিতেছিল। তিনি দেখিলেন, সেই ভিখারীর কুকুরটা ঝোপের আড়ালে বসিয়া তাঁহাকে দেখিতেছে!

তিনি তাড়াতাড়ি আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন, কুকুরটাও ভূতের মত চুপচাপ তাঁহার সঙ্গে চলিল। তিনি থামেন তো কুকুরও থামে, তিনি চলেন তো কুকুরও চলে। কুকুরের জ্বলন্ত দৃষ্টি পূর্ণবাবুর উপর নিবদ্ধ!

পূর্ণবাবুর কেমন একটা ভয় হইল, আবার সেই সঙ্গে রাগও হইল যথেষ্ট। তিনি গোঁয়ার গোবিন্দ লোক, হঠাৎ একটা পাথরের টুকরা লইয়া কুকুরের মুখে খুব জোরে ছুঁড়িয়া মারিলেন। কুকুরের নাক দিয়া দবদর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, কিন্তু সে এক চুলও নড়িল না! খালি তাহার চোখ দুটি দশগুণ জ্বলিয়া উঠিল। মুখে শব্দ নাই, পলাইবার চেষ্টা নাই, কুকুর শুধু পূর্ণবাবুর উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অন্ধকারে তাহাকে নেকড়ে বাঘের মত ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে! পূর্ণবাবুর একেবারে ধাঁধা লাগিয়া গেল, একটু একটু ভয়ও হইতে লাগিল। তিনি চোখমুখ বুজিয়া বাগান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন আর হাইকোর্টের কাছে ট্রামে চড়িয়া বাড়ি ফিরিলেন।

যে বন্ধ গলিতে পূর্ণবাবুর বাড়ি, সেই গলি গিয়া একটি ক্ষুদ্র পতিত জমিতে শেষ হইয়াছে। এই জমির এক পাশে পূর্ণবাবুর একতলা বাড়ি। জমির আর এক পাশে কতগুলি মুদির দোকান ও পানের দোকান। দোকানগুলি দিনের বেলায় খোলা থাকে, রাত্রে বন্ধ হইয়া যায়, তখন সেখানে লোক থাকে না। জমির অন্য দুই পাশে একটি পোড়ো বাড়ি ও একটি আস্তাবল, মধ্যে মধ্যে সেখানে লোক আসে বটে, কিন্তু তখন কেহ ছিল না। জমির মাঝখানে একটি তেঁতুল গাছ ও একটি ন্যাড়া বেল গাছ। পূর্ণবাবু বাড়িতে একাই থাকেন। একটি চাকর দিনের বেলায় আসিয়া কাজ করিয়া দেয়, রাতে চলিয়া যায়।

বাড়ি ফিরিয়াই পূর্ণবাবু খাইতে বসিলেন। আলুর দম, ছোলার ডাল, বেগুন ভাজা দিয়া তিনি খুব তৃপ্তির সঙ্গে ভাত খাইলেন। খাইবার সময় তিনি একেবারে সুখসাগরে ডুবিয়া যাইতেন, অন্য কথা তখন মনেই আসিত না। কিন্তু খাওয়া হইবামাত্রই তাঁহার ইডেন গার্ডেনের সমস্ত ঘটনার কথা মনে পড়িল, তিনি মুখ ধুইয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। সেদিন বড় গুমট গরম ছিল, তাই ঘরের একটি জানালা খুলিয়া রাখিলেন। বাহিরে অল্প অল্প চাঁদের আলো ছিল। অল্পক্ষণ পরেই তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাত প্রায় একটার সময় তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আর বোধ হইল যেন ঘরে কেহ রহিয়াছে। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। আবার মনে হইল, কে যেন তাঁহাকে দেখিতেছে; অথচ ঘরে কেহ ছিল না। বিছানায় বসিয়া

পূর্ণবাবু জানলা দিয়া সামনের জমির দিকে তাকাইলেন, জমির মাঝখানের তেঁতুল-গাছের উপর চোখ পড়িতেই তিনি এমন একটি দৃশ্য দেখিতে পাইলেন, যাহাতে তাঁহার গায় কাঁটা দিল। গাছের উপর সেই ভিখারী থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে ও পূর্ণবাবুকে দেখিতেছে! ভিখারীর দাড়ির লোম সজারুর কাঁটার মত খাড়া হইয়া আছে, তাহার চোখে পলক নাই, আর অন্ধকারে সেই চোখ প্যাঁচার চোখের মত জ্বলিতেছে। লম্বা লম্বা আঙ্গুল দিয়া ভিখারী গাছের ডাল খামচাইয়া ধরিয়াছে।

পূর্ণবাবু চোখ ফিরাইতে পারিলেন না, কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। তারপর হুঁস হওয়া মাত্রই জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা বিছানায় রহিলেন, ঘুম আসিল না। শেষে বাতি জ্বালিয়া অনেক কষ্টে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

সকালে উঠিয়া দেখিলেন, সেই ভিখারী গাছের ছালে খামচাইয়া খামচাইয়া লিখিয়া গিয়াছে—'তোর কর্মের ভূত তোর ঘাড়ে চেপেছে।'

দুপুরে অফিসে যাইবার সময় দেখিলেন ভিখারী একটা ছেঁড়া কম্বল জড়াইয়া পড়িয়া আছে, তাহার চোখ লাল। বিকালে অফিস হইতে ফিরিবার পথে বলরামের দোকানের কাছে আসিয়া দেখিলেন ভিখারী সেইভাবেই পড়িয়া আছে, কুকুরটা তাহার পাশে ম্লান মুখে বসিয়া আছে। পরদিন সকালে দেখিলেন ভিখারী সেখানে নাই, শুধু কুকুরটা মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে।

একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া পূর্ণবাবু জানিতে পারিলেন যে, ভিখারী জ্বরে ভুগিয়া মারা গিয়াছে; বলরাম তাহাকে শ্মশানে দাহ করিতে গিয়াছে। কুকুরটাও সঙ্গে গিয়াছিল, একটু আগে ফিরিয়া আসিয়াছে। বলরাম একজন ডাক্তার ডাকিয়াছিল, কিন্তু তিনি রোগ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন—'একে বৃদ্ধ বয়স, তাহাতে এই কঠিন জ্বর, বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই!' ভিখারী মরিবার আগে দুইবার 'জয় গুরু' বলিয়াছিল।

ভিখারী মরিয়াছে শুনিয়াই পূর্ণবাবু একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার হাসিও পাইয়াছিল, কিন্তু মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া বলিলেন, 'আহা! লোকটা মারা গেল। এত যাদুবিদ্যা জেনেও মরণের হাত এড়াতে পারল না? বলরাম ডাক্তার ডেকেছিল, আবার শ্মশানে গিয়াছে, ভালোই করেছে। ভিখারী এতদিন এ পাড়ায় থাকাতে সকলেরি তার প্রতি একটা টান ছিল।'

সেদিন পূর্ণবাবু খুব নিশ্চিন্তমনে অফিসের কাজ করিলেন। বিকালে লেমনেড,

মোহনভোগ, খেজুর ও রসগোল্লা খাইয়া জলযোগ সারিলেন। রাত্রে তিনজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ কবিয়া খাওয়াইলেন। রাত্রি দশটা পর্যন্ত গল্প করিয়া ও তাস খেলিয়া কাটাইলেন। বন্ধুরা চলিয়া গেলে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে গেলেন—ভিখারী তাঁহাকে আর জ্বালাতন করিবে না।

অনেকক্ষণ আরামে ঘুমাইবার পর শেষ রাত্রে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জানালা দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া ঘরের ভিতরে দেওয়ালের গায়ে পড়িয়াছিল। হঠাৎ ঘরের ভিতর কাহার মুণ্ডুর ছায়া দেখা গেল। পূর্ণবাবু প্রথমে মনে করিলেন উহা চোখের ভুল। কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, ঘরের ভিতর ঠিক যেখানে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে কিসের মাথার ছায়া নড়িতেছে। তিনি এক লাফে উঠিয়া বসিলেন। আর জানালার দিকে মুখ ফিরাইতেই একেবারে চমকাইয়া গেলেন।

জানালার উপর সামনের দুই থাবা রাখিয়া, জানালার গরাদে মুখ ঠেকাইয়া, অতি ভয়ঙ্কর মুখভঙ্গী করিয়া সেই কুকুরটা দাঁড়াইয়া আছে! তাহার জ্বলজ্বলে সবুজ সবুজ চোখ দিয়া রাগ ও ঘৃণা যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে, তাহার নিশ্বাসের দুর্গন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছে। কুকুরটা মধ্যে মধ্যে খুব জোরে নিশ্বাস ফেলিতেছে আর এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ করিতেছে!

পূর্ণবাবু চোখ বুজিয়া ফেলিলেন, তাঁহার গা দিয়া ঘাম বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিলে পর তিনি চোখ খুলিয়া দেখিলেন, কুকুরটা জানালা হইতে নামিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি তিনি জানালা বন্ধ করিতে গেলেন আর দেখিতে পাইলেন যে কুকুরটা তেঁতুলগাছ আর ন্যাড়া বেলগাছের পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। মুহূর্তের জন্য কুকুরটা দুই পায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া পূর্ণবাবুকে আর একবার দেখিয়া নিল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণবাবুও জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার আর ঘুম হইল না, বাতি জ্বালিয়া জাগিয়া রহিলেন।

২

পরদিন সকালে পূর্ণবাবু পাঁচটি টাকা সঙ্গে লইয়া বলরামের দোকানের দিকে রওনা হইলেন। কি বলিয়া বলরামকে টাকাগুলি দিবেন তাহা ঠিক ভাবিয়া পাইতে ছিলেন না অথচ খাবারের দাম চুকাইয়া দিবার জন্য তখন তাঁহার বেশ আগ্রহ হইয়াছিল। মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে বলরামের দোকানে গিয়া

দেখিলেন দোকান বন্ধ। খোঁজ করিয়া জানিলেন যে, বলরাম এক সপ্তাহের জন্য কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে।

সেদিন অফিসে গিয়া তিনি তেমনভাবে কাজে মন দিতে পারিলেন না। অফিসের লোকেরা তাঁহার পাঁশুটে মুখ আর কাহিল শরীর দেখিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিল। কেহ কেহ বলিল—'এঃ! রসগোল্লার মত শরীর ছিল, এখন একেবারে আমসি হয়ে গিয়েছে!' একজন বলিল—'তা শহরময় যেরকম ডেঙ্গু আর ইনফ্লুয়েঞ্জা তাতে শরীর ভাল থাকা কঠিন।' পূর্ণবা বলিলেন—'হ্যাঁ, শরীরে আর কিছু নাই, দুই সপ্তাহের ছুটি নিতেই হবে।'

ছুটি পাইয়াই পূর্ণবাবু ধানবাদ রওনা হইলেন। ধানবাদ ইস্টার্ন রেলওয়ের গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইনের একটি স্টেশন, কলিকাতা হইতে ১৬৯ মাইল দূর। ধানবাদ শহরের বাহিরে প্রায় ৩।৪ মাইল পশ্চিমে ডাক্তার ভূষণচন্দ্র সেনের বাড়ি; ভূষণবাবু পূর্ণবাবুর বন্ধু। তিনি পূর্ণবাবুকে ধানবাদে যাইবার জন্য অনেকবার চিঠি লিখিয়াছেন। পূর্ণবাবুও ছুটি পাইয়াই জিনিসপত্র গুছাইয়া চাকরকে সঙ্গে করিয়া গয়া প্যাসেঞ্জারে চাপিয়া একেবারে ধানবাদে ভূষণবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

ধানবাদ হইতে পরেশনাথ পাহাড়ের দিকে যাইতে রেলের লাইনের দক্ষিণ-পশ্চিমে অনেকদূর পর্যন্ত সারি সারি চিমনি দেখা যায়। এগুলি কয়লার খনির চিমনি। এই সব কয়লার খনি ভূষণবাবুর বাড়ি হইতে প্রায় এক মাইল দূরে। দুইটি ছোট ছোট বাড়ি, একটিতে নিজে থাকেন, আর একটি পূর্ণবাবুর ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। প্রথম বাড়ি হইতে দ্বিতীয় বাড়িটি প্রায় ২০০ হাত দূরে। এখানে আসিয়া পূর্ণবাবু বেশ ভাল বোধ করিতেছেন। জায়গাটি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। সঙ্গে চাকর আছে, তাহার উপর একজন মালী বাড়ির বাগানে কাজ করে; সে রাত্রে বাগানেরই একধারে একটি কুঁড়েঘরে থাকে। মালী খুব ষণ্ডাগুণ্ডা। পূর্ণবাবু খুব নিরাপদ বোধ করিতেছেন আর তাঁহার খুব ক্ষুধা হইয়াছে।

পূর্ণবাবুর বাড়ির উত্তরদিকে অনেক দূরে রেলের লাইন দেখা যায়, দক্ষিণে একমাইল তফাতে কয়লার খনি, পশ্চিমে বহু দূরে একটা সাঁওতাল পাড়া অস্পষ্ট দেখা যায়, পূর্বদিকে অল্প দূরে একটি নূতন বাড়ি হইতেছে, বাঁশ বাঁখারি পোঁতা হইয়াছে, অনেকগুলি ইঁট গাঁথা হইয়াছে। চারিদিকে উঁচু নিচু জমি, খানাখন্দ বিস্তর আছে। গরুর গাড়ি যাইবার মত রাস্তাও আছে।

সন্ধ্যার আগেই পূর্ণবাবু তাঁহার বন্ধুর সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হন। ভূষণবাবু খুব আমুদে লোক, আর অনেক গল্প জানেন। পূর্ণবাবু খুব আনন্দে আছেন,

একদিন কয়লার খনি দেখিয়া আসিয়াছেন। কুকুরের কথা প্রায় তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, আর ভিখারী তো মরিয়াই গিয়াছে।

ভূষণবাবু ডাক্তার, তিনি প্রথমদিন পূর্ণবাবুর কাহিল শরীর আর বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দুই-তিনদিনের মধ্যেই পূর্ণবাবুর স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখিয়া তিনিও নিশ্চিন্ত হইলেন।

একদিন সকালে পূর্ণবাবু বেড়াইতে বাহির হইবেন, এমন সময় তাঁহার চাকর 'কত্তা' বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিল। পূর্ণবাবু দাঁড়াইলে সে বলিল যে সেদিন রাত্রে সাঁওতাল পাড়ায় ভূতপূজা আছে। মালী সেই পূজা দেখিতে যাইবে, সেও মালীর সঙ্গে যাইতে চায়। পূর্ণবাবু বলিলেন যে রাতে তাঁহার খাওয়া হইয়া গেলে তাহারা যাইতে পারে।

সেদিন বিকালে তিনি আর ভূষণবাবু বেড়াইতে বেড়াইতে একটা টিপি দেখিতে পাইলেন। টিপিটা ৩০।৪০ হাত উঁচু, আর ছোট ছোট গাছপালায় ঢাকা।

তাঁহারা সেই টিপির উপর উঠিলেন আর একটা পাথরে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সামনে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে একটা অন্ধকার গর্ত ছিল।

ভূষণবাবু বলিলেন, 'কাল রাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। একজন সাঁওতাল একটা পাখি মেরে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরছিল। এমন সময় কি একটা জানোয়ার একেবারে ঝড়ের মত গুড়মুড় করে তার ঘাড়ে এসে পড়ল। আর তার হাত থেকে পাখিটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। অন্ধকারে সাঁওতাল সেই জানোয়ারটাকে ভাল দেখতে পেল না, কিন্তু একটি অদ্ভুত বুনো গন্ধ তার নাকে এসেছিল। সাঁওতালদের বিশ্বাস যে সেটা ভূত। আজ সাঁওতাল পাড়ায় ভূতপুজো হবে।'

পূর্ণবাবু বলিলেন, 'আমার চাকর আর মালীও ভূতপুজো দেখতে যাবে।'

গল্প করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিলে তাঁহারা আস্তে আস্তে উঠিয়া টিপি হইতে নামিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সামনের গর্তের ভিতর একটা জানোয়ারের অস্পষ্ট চেহারা দেখা গেল। পরমুহূর্তেই জানোয়ারটা গুঁড়ি মারিয়া তাঁহাদের দিকে আসিতে লাগিল। পূর্ণবাবু হাতের লাঠিটা শক্ত করিয়া ধরিলেন। ভূষণবাবুর হাতে কিছু ছিল না তিনি শুধু ঘুষি পাকাইয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ণবাবুর দিকেই জন্তুটার বেশি নজর ছিল। কিন্তু ভূষণবাবু হাততালি দিয়া জন্তুটাকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিতে সে তীব্রবেগে তাঁহাকেই আক্রমণ করিল। বন্ধুকে বাঁচাইবার জন্য পূর্ণবাবু লাঠি দিয়া জানোয়ারের মাথায় এক ঘা বসাইয়া দিলেন। জন্তুটা
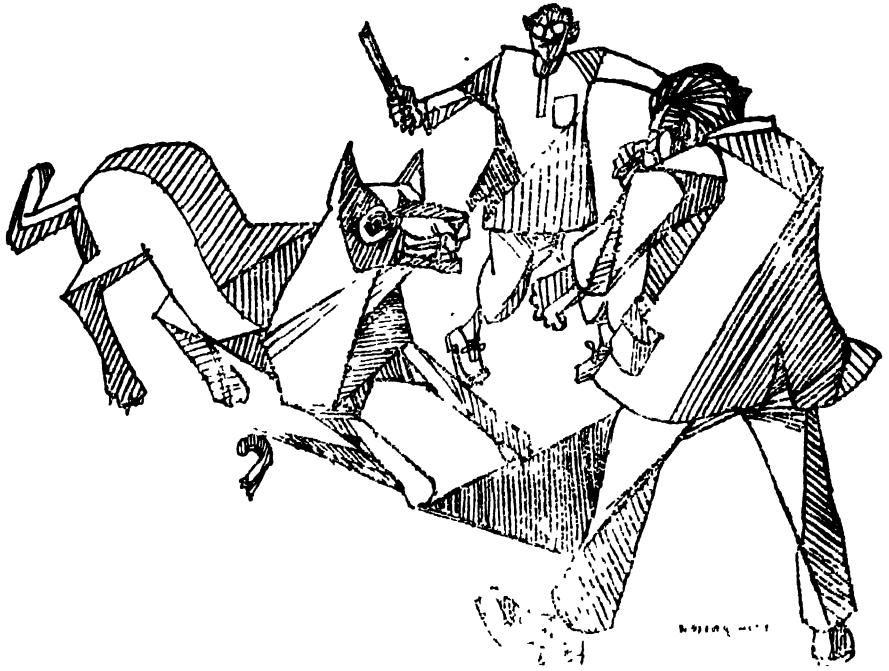
লাঠিতে এমন কামড় বসাইল যে লাঠি ভাঙ্গিয়া গেল। ততক্ষণে ভূষণবাবু জন্তুটার ব্রহ্মতালুতে ভীষণ এক কীল মারিলেন। জন্তুটা ক্রোধে গর্জন করিতে আর দাঁত খিঁচাইতে লাগিল কিন্তু আর আক্রমণ করিল না। কিছুক্ষণ তর্জন গর্জন করিয়া টিপির গা দিয়া নামিয়া গেল। ভূষণবাবু বলিলেন, ওটা একটা নেকড়ে বাঘ! ফিরিবার পথে সমস্তক্ষণ শুধু নেকড়ে বাঘের কথাই হইল।

সেদিন রাত্রে খাওয়া শেষ করিয়া পূর্ণবাবু চাকরকে বলিলেন, 'আজ ডাল, আলুর দম আর চাটনী খুব ভাল হয়েছে। পুলিপিঠেও বেশ হয়েছে। এখন ভূতপুজো দেখতে যেতে পারিস।'

একটু পরেই তিনি আবার বলিলেন, 'সঙ্গে লাঠি নিয়ে যাস, নেকড়ে বাঘ বেরিয়েছে, আমরা আজ বেড়াতে গিয়ে অনেক কষ্টে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি। আমার লাঠিটা একেবারে ছাতু হয়ে গিয়েছে।'

চাকর মালীর সঙ্গে ভূতপূজা দেখিতে চলিয়া গেল। তখন রাত ৯টা। পূর্ণবাবু একটা টেবিলের পাশে বসিয়া কতকগুলি বই দেখিতেছেন। ভূষণবাবু তাঁহাকে কতগুলি মাসিক পত্রিকা ও ছবির বই দিয়াছিলেন, পূর্ণবাবু সেগুলি নাড়াচাড়া করিতেছেন। ঘরের একটা জানালা খোলা রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে একটা বিশ্রী

ঠাণ্ডা, দমকা বাতাস সেই জানালা দিয়া ঢুকিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া সেই দমকা বাতাসের সঙ্গে একটা দুর্গন্ধ আসিতেছে, কতকটা বাঁশপচা গন্ধের মত। অল্প দূরে যে নূতন বাড়ি হইতেছিল সেই দিক হইতেই গন্ধ আসিতেছিল।

পত্রিকাগুলি চোখ বুলাইয়া দেখিয়া পূর্ণবাবু ছবির বই দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটা পাতায় তিনি এক কাবুলী ফলওয়ালা আর তাহার কুকুরের ছবি দেখিয়া চমকাইয়া গেলেন। কাবুলীর চেহারা অনেকটা সেই ভিখারীর মত, আর কুকুরটার চেহারা সেই ভিখারীর কুকুরটার মত। ঠিক একরকম নয় বটে, কিন্তু সাদৃশ্য খুব বুঝিতে পারা যায়। পূর্ণবাবু বিরক্ত হইয়া বই বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। যেসব কথা তিনি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সেই সব স্মৃতি সেই ছবিতে জাগাইয়া দিল।

বই রাখিয়া পূর্ণবাবু ঘুমাইবার চেষ্টায় বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। মধ্যে মধ্যে শিয়ালের ডাক শোনা যাইতেছিল। অনেক দূর হইতে অস্পষ্ট কোলাহল ও ঢাক-ঢোলের ক্ষীণ শব্দ আসিতেছিল। বোধ হয় উহা সাঁওতালদের ভূতপূজার কোলাহল। পূর্ণবাবুর চোখ আস্তে আস্তে বুজিয়া আসিল। এইভাবে কতক্ষণ কাটিয়াছে তিনি জানেন না। সহসা বাহিরে একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনা গেল। পূর্ণবাবু সেদিকে চাহিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মন ভয় বিস্ময় ও বিরক্তিতে ভরিয়া গেল। ছবিতে কাবুলীর চেহারা তিনি দেখিয়াছিলেন, সেই কাবুলী জীবন্ত অবস্থায় বাগানের এক কোণে মাথা নিচু আর ঠ্যাং উঁচু করিয়া মাথায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাবুলীর মুখে শয়তানের হাসি!

ভয়ে পূর্ণবাবুর মুখ আপনা হইতেই অন্য দিকে ফিরিয়া গেল। কিন্তু, একি!! তিনি দেখিলেন, ঘরের এক কোণে সেই কাবুলীর কুকুরটা ঘরের ছাদের দিকে পিছনের ঠ্যাং তুলিয়া দিয়া মাথায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কুকুরের মুখে শয়তানের হাসি।

ভয়ে পূর্ণবাবুর মাথার ঘি পর্যন্ত জমিয়া কুলপী বরফ হইয়া গেল। এক লাফ দিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলেন তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন!

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলেও তাঁহার ভয় একেবারে গেল না। তিনি বহুকষ্টে রাত কাটাইলেন। সকালে চাকর আর মালী বাড়ি ফিরিল। তাহাদের দেখিয়াই তিনি বলিলেন—'দেখিস, এখন থেকে তোরা দুজনে একসঙ্গে রাত্রে বেরিয়ে যাবি না, একজনকে বাড়িতে থাকতেই হবে।' তারপর তিনি সেই ছবির বইটা ভূষণ-বাবুকে ফেরত পাঠাইলেন।

কিছুদিন পরে একবার পূর্ণবাবু রাত্রির আহার শেষ করিয়া বাগানে একটি চেয়ারে বসিয়া হাওয়া খাইতেছিলেন। চাকর বারান্দায় বসিয়া একটি দড়ি পাকাইতেছিল আর মালী তাহার কুঁড়েঘরে বসিয়া রামায়ণ পড়িতেছিল। পূর্ণবাবু আকাশের দিকে তাকাইয়া আছেন আর চাঁদ, তারা, মেঘ দেখিয়া ছেলেবেলার অনেক কথা ভাবিতেছেন। নানা আকারের মেঘের টুকরো আকাশে ভাসিয়া যাইতেছে। অনেকক্ষণ আকাশ দেখিয়া পূর্ণবাবু বাগানের গাছপালা দেখিতে লাগিলেন। একটি গাছের দিকে বিশেষভাবে তাঁহার মনোযোগ গেল। গাছের ঘন ডালপালার মধ্যে দুইটি উজ্জ্বল চোখ দেখা যাইতেছিল। শরীর নাই, মাথা নাই, শুধু দুইটি জ্বলন্ত চোখ গভীর অন্ধকারে বসিয়া তাঁহাকে দেখিতেছে!

পূর্ণবাবু ধড়ফড় করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চাকর, 'কত্তা! কত্তা!' বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিল। পূর্ণবাবু ইসারা করিয়া তাহাকে সেই চোখ দেখাইয়া দিলেন। চাকরও ভয় পাইয়া শুধু হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। এমন সময়ে সেই ষণ্ডাগুণ্ডা মালী 'হোজুর! হোজুর!' বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিল আর হাতের লাঠি ছুঁড়িয়া সেই গাছে মারিল। অমনি গাছ হইতে একটা প্রকাণ্ড প্যাঁচা উড়িয়া গেল। অন্ধকারে প্যাঁচার চোখ দুইটা শুধু দেখা যাইতেছিল, তাহা দেখিয়াই পূর্ণবাবু ভয় পাইয়াছিলেন। মালী কুঁড়েঘরে ফিরিয়া গিয়া আবার রামায়ণ পড়িতে লাগিল।

পরদিন সকালে পূর্ণবাবু ভূষণবাবুকে বলিলেন, 'আমাকে আজকেই কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। ভেবেছিলাম আরো দুদিন থেকে যাব, কিন্তু সে আর হল না।' সেই দিনই পূর্ণবাবু একেবারে বোম্বে মেলে চড়িয়া কলিকাতায় ফিরিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া পূর্ণবাবু ভিখারীর কুকুরটাকে দেখিতে পাইলেন না। বাড়িতে জিনিসপত্র রাখিয়া তিনি বলরাম ময়রার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, 'দেখ, একটা বড় ভুল হয়ে গিয়েছে। সেদিন তুমি দোকানে ছিলেনা, তখন তোমার দোকান থেকে বাবড়ি আর সরভাজা নিয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ ধানবাদ থেকে খবর এল যে, আমার সেখানে যাওয়া দরকার, তুমিও কলকাতার বাইরে গিয়েছিলে। এই সব কারণে খাবারের দাম চুকিয়ে দিতে দেরি হল।'

ময়রা বলিল—'তা আর কি হয়েছে। শুধু আমাকে একবার জানালেই হত, তাহলে এত ভাবতাম না, আপনি নিয়েছেন জানলে নিশ্চিন্ত থাকতাম।'

পূর্ণবাবু দাম চুকাইয়া দিয়া দোকানে বসিলেন আর জিজ্ঞাসা করিলেন—'কুকুরটা গেল কোথায়?'

ময়রা বলিল—'কুকুরটা আজকাল কিছু খায় না, চুপচাপ পড়ে থাকে। ভিখারী মারা যাবার পর থেকে সে কেমন হয়ে গিয়েছে। ভিখারীকে যে শ্মশানে দাহ করা হয়েছিল, কুকুরটা পরশু থেকে সেইখানেই রয়েছে। খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ, খুব রোগা হয়ে গিয়েছে, বেশীদিন বাঁচবে না।'

তখন পূর্ণবাবু আর বলরামের মধ্যে এইভাবে কথা হইতে লাগিল :

পূর্ণবাবু—'আচ্ছা, ভিখারী নাকি প্রেতসিদ্ধ ছিল? সে নাকি ভূতের সঙ্গে কথা বলত?'

বলরাম—'ও সব কথা ঠিক বিশ্বাস হয় না, তবে ভিখারী নানারকম ভোজবিদ্যা আর ভেলকিবাজী জানত, পাড়ার ছেলেদের ম্যাজিক দেখাত। তার চেহারা ভূতের মত হলেও সে খুব আমুদে আর মজার লোক ছিল। পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের অনেক সময় তামাসা করে ভয় দেখাত।'

পূর্ণবাবু—'আচ্ছা, কুকুরটার বিষয় কিছু জান?'

বলরাম—'কুকুরটাকে ভিখারী এক সাহেবের বাড়িতে প্রায় আট বছর আগে পেয়েছিল। নিজের চেহারার সঙ্গে কুকুরটার চেহারার সাদৃশ্য দেখে সেই সাহেবের কাছে কুকুরটা চেয়ে নিয়েছিল। কুকুরটা তখন একেবারে বাচ্চা। একটা পা একটু খোঁড়া, নাকের ডগায় সাদা দাগ, আর চোয়ালের লোম লম্বা। কুকুর ভিখারীর খুব ভক্ত ছিল। ভিখারী যার উপর রেগে যেত, কুকুরও তার উপর খুব রাগ করত। ভিখারী রাত্রে কলকাতার চীনেপটিতে এক চীনেম্যানের বাড়িতে একটা তক্তপোষে শুয়ে থাকত, আর লোকে বলত সে ভূতের দেশে গিয়েছে। কুকুরটা সেই তক্তপোষের তলায় শুয়ে থাকত। চীনেম্যানরা ভিখারীকে চা খেতে দিত।'

পূর্ণবাবু—'আচ্ছা, ভিখারী কি সূক্ষ্ম শরীরে ঘুরে বেড়াত?'

বলরাম—'তা ঠিক জানি না। সে একটু আধটু যোগ অভ্যাস করত বটে। সে খুব আমুদে লোক ছিল। মরবার আগে বলেছিল—শরীরের কলকব্জায় মরচে ধরেছে, আর বেশীদিন বাঁচব না! তার গুরু এখনও বেঁচে আছেন। ভিখারীর পঁয়ষট্টি বছর বয়স হয়েছিল।'

পূর্ণবাবু আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরিলেন, আর খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলেন।

৩

ইহার পর প্রায় পাঁচমাস কাটিয়া গেল। একদিন পূর্ণবাবু অফিস হইতে ফিরিবার পথে দেখিলেন, একজন বৃদ্ধ বলরামের দোকানে বসিয়া কচ্ছপের খোলায়

চা ঢালিয়া খাইতেছেন। লোকটির অত্যন্ত প্রাচীন বয়স, মুখে সরু লম্বা সাদা দাড়ি, ছোট চোখ, কিন্তু চাহনি বড়ই তীব্র। বৃদ্ধ এক খোলা চা শেষ করিয়া আবার কচ্ছপের খোলায় চা খাইতে লাগিলেন। পূর্ণবাবু তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন, এমন সময় তিনিও পূর্ণবাবুর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, আর অল্পক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া আবার নিবিষ্ট মনে চা খাইতে লাগিলেন। পূর্ণবাবু ভাবিলেন যে তিনি একজন বৈরাগী বা ফকির হইবেন। সন্ধ্যার পর বেড়াইতে যাইবার সময় পূর্ণবাবু দেখিলেন যে বৃদ্ধটি বলরামের দোকান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। পূর্ণবাবু বলরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঘণ্টাখানেক আগে একজন বুড়ো ফকিরকে এখানে চা খেতে দেখেছি—তিনি কে?'

বলরাম বলিল—'ইনি সেই ভিখারীর প্রেতসিদ্ধ গুরু। এঁর কাছেই ভিখারী নানারকম ভেলকিবাজী শিখেছিল। এঁর সর্দি হয়েছিল, তাই তালমিশ্রি আর জাফরানের গুঁড়ো দিয়ে চা খাচ্ছিলেন। কাল আবার চা খেতে আসবেন, তখন আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। এঁর নাম রঙ্গিয়াবাবা।'

পূর্ণবাবু বলিলেন—'শুনেছি ভিখারী মারা যাবার সময় 'জয়গুরু, জয়গুরু' বলেছিল, ইনিই কি তার সেই গুরু?'

বলরাম বলিল—'ইনিই ভিখারীর গুরু বটেন। আপনি রঙ্গিয়াবাবার সঙ্গে আলাপ করে সুখী হবেন, লোকটির নানা বিদ্যা জানা আছে।'

রঙ্গিয়াবাবার পরিচয় লাভ করিবার জন্য পূর্ণবাবুর খুবই আগ্রহ হইল। তিনি বলিলেন, 'কাল বিকালে নিশ্চয় আসব। বৃদ্ধের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিও।'

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে বলরামের দোকানে রঙ্গিয়াবাবার রুক্ষ, রহস্যপূর্ণ মূর্তি দেখা দিল।

'বসতে আজ্ঞা হোক বাবাজী, চা খাবেন?' এই বলিয়া বলরাম তাঁহাকে নমস্কার করিল।

বাবাজী বলিলেন—'হ্যাঁ, চা দিতে পার। আর দেখ হে, চায়ের সঙ্গে একটু রাবড়ি মিশিয়ে দিতে পার? রাবড়ি মিশ্রিত চা এক অপূর্ব দেবভোগ্য সামগ্রী। আমার সঙ্গে কিছু গোলাপজল আছে, দরকার হলে এক ফোঁটা মিশিয়ে নিব।'

বলরাম একটা ভাঁড়ে চা আর রাবড়ি মিশাইয়া বাবাজীর হাতে দিল। বাবাজী তাঁহার কচ্ছপের খোলায় সেই চা ঢালিয়া সামান্য গোলাপজল মিশাইয়া নাড়িতে লাগিলেন। পূর্ণবাবুও ঠিক সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত হইলেন।

বলরাম পূর্ণবাবুকে বাবাজীর নিকট পরিচিত করিয়া দিল। বাবাজী তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া একমনে চা খাইতে লাগিলেন।

পূর্ণবাবু এইবার রঙ্গিয়াবাবাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা পাইলেন। বাবাজীর চুল দাড়ি একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘ শরীরে মাংস খুব অল্পই আছে, কিন্তু দেখিলেই বুঝা যায় যে এককালে শরীরের বাঁধ খুব শক্ত ছিল। চর্ম এখন কর্কশ ও মলিন হইয়া গিয়াছে, বহুদিন আগে সাদা ও মোলায়েম ছিল। পরিধানে মোটা ধুতি, বহু পুরাতন গোলাপী রঙ্গের একখানি র‍্যাপার, আর কুমিরের চামড়ার নাগরাই জুতা। বাবাজী চা খাইতে খাইতে বলিলেন,

'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে
তা আছে ভাণ্ডে
যা নাই ভাণ্ডে
তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে!'

'অর্থাৎ মনের মধ্যে যে ভাব থাকবে, ব্রহ্মাণ্ডেও সেই ভাব দেখতে পাবে। মনে আনন্দ থাকলে বাইরেও আনন্দ পাবে। মনে আনন্দ না থাকলে বাইরে আনন্দ খুঁজেই পাবে না। আবার ব্রহ্মাণ্ডে যেসব তত্ত্ব আছে, এই শরীর ভাণ্ডেও সেই সব তত্ত্ব নানাভাবে বর্তমান আছে। এই দেখ, সেদিন সর্দি হয়েছিল, কিছু ভাল লাগছিল না, কিন্তু যেই বলরামের দোকানে এসে গরম গরম চা খেলাম অমনি শরীরে বিদ্যুতের সঞ্চার হল, অনাহত চক্রের প্যাঁচ খুলে গেল, কণ্ঠনালীর শ্যাওলা সাফ হয়ে গেল, তখন সবই ভাল বোধ হতে লাগল। তাই বলছিলাম, ভিতরটাই আসল, বাইরের জগৎ কিছু নয়।'

পূর্ণবাবু বলিলেন—'আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, এর মধ্যে কি আপনার সময় হবে?'

বাবাজী—'কলকাতার নৈঋত কোণে শিবপুরের বোটানী বাগান আছে জানেন?'

পূর্ণবাবু—'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেখানে অনেকবার গিয়েছি।'

বাবাজী—'সেই বাগানের উত্তরমুখী দরজায় একজন চীনেবাদামওলা বসে থাকে। তাকে বললেই সে আমার কুটির দেখিয়ে দেবে। তবে এক সপ্তাহ দেরী করে যাবেন, আমি পাঁচ ছয়দিনের জন্য চুঁচ্‌ড়ো যাব, সেখানকার গোরস্থান খুব সুন্দর জায়গা।'

চা-পান শেষ করিয়া বাবাজী বলিলেন—'৮৩ বছর বয়স হল, এখন শরীরটাকে রিফ্‌কর্ম করে, জোড়াতালি দিয়ে সারিয়ে নিতে হবে। গয়ার পাহাড়-পর্বতে নানারকম শিকড়-বাকল পাওয়া যায়। এক মাসের মধ্যেই গয়া যাব।'

এই বলিয়া বাবাজী চলিয়া গেলেন।

এক সপ্তাহ পরে একদিন বিকালে পূর্ণবাবু বাবাজীর নির্দেশমত শিবপুর বাগানের উত্তরমুখী দরজায় উপস্থিত হইলেন, এবং সেই চীনেবাদামওলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বাবাজীর কুটির বাহির করিলেন। বাগানের ভিতরেই বাবাজীর স্বহস্ত-নির্মিত কুটির। বাগানের একজন মালী রঙ্গিয়াবাবার পরম ভক্ত, সে তাহার ঘরের পাশেই বাবাজীকে কুটির স্থাপন করিতে দিয়াছে।

অতি পুরাতন অথচ মজবুত এক তক্তপোষের উপর প্যাকিং কেসের কাঠ, বাঁশ, টিন ও তিরপল দিয়া কুটির তৈয়ারী হইয়াছে। কাঠের দেওয়ালে টিনের ঢালু ছাদ, বাঁশ আর তিরপলের তৈয়ারী দরজা।

মালীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পূর্ণবাবু জানিলেন যে বাবাজী বাগানের মধ্যেই

বেড়াইতেছেন। তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা বৃথা। তিনি বিড়ালের মত নিঃশব্দে বেড়ান। রাস্তায় চলিবার সময় লাঠি ঠকঠক করেন বটে, কিন্তু বাগানে ঢুকিয়াই একেবারে নিঃশব্দ হইয়া যান। গাছের আড়াল দিয়া ঝোপের পাশ দিয়া চলাফিরা করেন, সহজে কেহ দেখিতে পায় না। বাবাজীর ফিরিবার সময় হইয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই কুটিরে ফিরিবেন।

কুটিরের তিনচারটি জানালা। তাহার মধ্যে একটি খোলা ছিল, পূর্ণবাবু জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন, কুটিরের ভিতরটি দুই অংশে বিভক্ত। কুটিরের পশ্চিমমুখী দেওয়ালের মধ্যস্থলে দরজা, দরজা দিয়া ঢুকিলেই ডানদিকে একটি আর বাঁ দিকে আর একটি ঘর পাওয়া যায়। দুই ঘরের মাঝখানে একটি মোটা পর্দা, উহাই দেওয়ালের কাজ করে। ডানদিকের ঘরে একটি মাদুর ও ছোট বালিস রহিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে দুটি ছবি ঝুলিতেছে, বোধ হইল, রঙ্গিয়াবাবা প্রেতসিদ্ধ হইলেও সৌখীন লোক, তাহাতে সন্দেহ নাই। একটি পাথরের উপর লাল নীল আর সবুজ রঙের মোমবাতি সাজানো রহিয়াছে। বাঁ-দিকের ঘরখানি ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না। তবে এইটুকু দেখা গেল যে, সেখানে একটি ছোট বালতির তৈয়ারী উনান রহিয়াছে।

কুটিরের দেওয়ালের গায়ে কতগুলি লোমশূন্য শুঁয়োপোকা রহিয়াছে। মালী বলিল যে আগে শুঁয়োপোকাগুলির লোম ছিল, কিন্তু উহারা বাবাজীকে জ্বালাতন করিত বলিয়া বাবাজীর অভিশাপে উহাদের লোম ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে। চিড়িয়াখানায় বাবাজীর অভিশাপগ্রস্ত একটি সিংহও আছে, উহার মাথা ন্যাড়া হইয়া গিয়াছে। বাবাজী একবার চিড়িয়াখানা দেখিতে গিয়া সিংহের খাঁচার সামনে দাঁড়াইয়াছিলেন ; সিংহটি তখন এমন জোরে এক হাঁচি দেয় যে সিংহের কফ আর একটু হইলেই বাবাজীর দাড়িতে আসিয়া পড়িত। ইহার ফলে সিংহের মাথায় ভীষণ মহিষদাদ হইয়া সমস্ত কেশর ঝরিয়া পড়িয়া যায়। পরে বাবাজী দয়া করিয়া সিংহের খাঁচায় একটি মাদুলি বাঁধিয়া দিয়াছেন, এখন আবার কেশর গজাইতেছে।

এইসব গল্প শুনিয়া পূর্ণবাবুর ভারি কৌতূহল হইল। তিনি নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে দেখেন, বাবাজীর কুটিরে আলো জ্বলিতেছে। বাবাজী যে কখন নিঃশব্দে আসিয়া কুটিরে ঢুকিয়াছেন, পূর্ণবাবু তাহা মোটেই টের পান নাই !

বাবাজী পূর্ণবাবুকে কুটিরে ঢুকিতে ইঙ্গিত করিলেন। পূর্ণবাবু ভিতরে

ঢুকিলেন। বাবাজীর দুই হাতের কনুইএর কাছে বাঘের দাঁতের তৈয়ারী মাদুলি ছিল, একটি ছোট ঝুলিতে অনেক খুঁটিনাটি জিনিস আর শিকড়বাকল ছিল। তিনি পূর্ণবাবুকে বসাইয়া বলিলেন—'আপনি একটু বসুন, আমি রান্নাঘর থেকে একবার আসি। চুঁচ্‌ড়ো গিয়ে খুব সজনে ডাঁটার তরকারী খেয়েছিলাম, তাই হজমশক্তি খুব বেড়ে গিয়েছে। সেখানকার গোরস্থানে বসে প্রায় দশহাজার বার ধানিলঙ্কার মালা জপ করেছি।'

৪

বাবাজী রান্না দেখিতে পাশের ঘরে গেলেন, পূর্ণবাবু মাদুরে বসিয়া ঘরের জিনিসপত্র দেখিতে লাগিলেন। দেওয়ালে একটি ছবি ঝুলিতেছে—চীনদেশীয় ড্র্যাগনের ছবি। অতি ভীষণ চেহারা, কুমির বা গোসাপের মত শরীর, নখ অতি দীর্ঘ, বিস্তৃত চক্ষু, সাপের জিভের মত জিভ, মুখের ভাব অত্যন্ত হিংস্র। ছবির নিচে এই কথাগুলি লেখা আছে—

'মহা কৃকলাসায় নমঃ
আদি গিরিগিটি, জ্যেষ্ঠ বাসুকি, কুম্ভীর
কুলাধিপতি
টিকটিকীশ্বর শ্রীশ্রীমহাকৃকলাসায় নমঃ'

উহার নিচে আর একটি ছবি—এক সাধুর ছবি। তাহার নিচে লেখা—

'হিমালয় পর্বতবাসী
মহাফুঙ্গি শ্রীমৎ লংসিং চিংপ্রদত্ত
মহামন্ত্র—
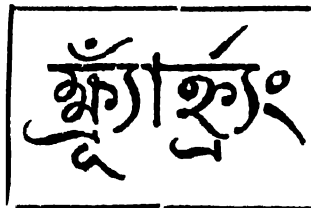
পূর্ণবাবু অনেক চেষ্টা করিয়াও মন্ত্রটি উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। ততক্ষণে রঙ্গিয়াবাবা রান্নাঘর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ণবাবু তাঁহাকে ছবি দুটির অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন।

বাবাজী বলিলেন—'এটি তুকচাঁদ বাউলের—অর্থাৎ আপনাদের পাড়ার সেই ভিখারীর কীর্তি। তার আসল নাম ছিল তুকচাঁদ বাউল। এটি তার গুরুদত্ত নাম, আমি নিজে তাকে এই নাম দিয়েছিলাম, আপনারা তাকে 'ভিখারী' বলে জানতেন। সে 'তুকমন্ত্র' বলে একখানা বই লিখেছিল, অর্থাভাবে ছাপাতে পারেনি। সে কুমিরমুখো চীনে ভূতের ছবি দেখে এই ছবিখানি এঁকেছিল আর মন্ত্রটি সে একজন চীনদেশী তান্ত্রিক সাধুর কাছে পেয়েছিল।'

পূর্ণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'মন্ত্রটির উচ্চারণ কিরকম?' বাবাজী বলিলেন—'আমি পারি না, তুকচাঁদ পারত।'

পূর্ণবাবু—'তুকচাঁদ কি প্রেতসিদ্ধ ছিল?'

বাবাজী বলিলেন—'সে সম্বন্ধে আমি নিজে কিছুই বলব না। তবে, তুকচাঁদকে আমি নানারকম ভেলকিবাজী শিখিয়েছিলাম। সে অনেক চোরডাকাতকে ভূতের ভয় দেখিয়েছিল। অনেক চোর ভূতের ভয়ে গ্রামছাড়া হয়েছিল। তা-ছাড়া সে 'তুকচাঁদ-ঘৃত' বলে একরকম ওষুধও বানিয়েছিল, তাতে ভূতপ্রেতের অত্যাচার নিবারণ করে। শেষে চোর ডাকাতরা নিরুপায় হয়ে তার ঘৃত ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। সে বলেছিল, 'যদি চুরি না করিস আর এই ঘৃত নিয়মিত খাস আর মালিস করিস তবে ভূতে ধরবে না।' একজন চোর এই ঘৃতের প্রস্তুত-প্রণালী জানতে চেয়েছিল, তুকচাঁদ লিখে দিল, 'তুকচাঁদের দাড়িভস্ম এক ছটাক, তদীয় দাড়ির উকুনভস্ম সিকিতোলা, বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত এক পোয়া একত্র সিদ্ধ করিলেই তুকচাঁদ-ঘৃত প্রস্তুত হইবে। পুনশ্চ, মাত্র আট আনা মূল্য দিলে দাড়ি ও উকুন পুটপাক ভস্ম করিয়া দিব। শত পুটিত উকুনভস্ম ও সহস্রপুটিত দাড়িভস্ম দিব। অনেকে এই ঘৃত নিতে আসত। তাছাড়া সে বাস্তবিক ভাল ভাল ওষুধও জানত। ভালো লোকদের সে ভাল ওষুধও দিত।'

পূর্ণবাবু—'তুকচাঁদের কুকুরটা কি প্রেতসিদ্ধ ছিল?'

বাবাজী—'ভূতপ্রেতের সঙ্গে আমাদের কি ভাবে কতদূর কারবার চলে সে সম্বন্ধে কিছু বলব না তা আগেই বলে রেখেছি। তবে তার কুকুরটার কিছু বিশেষ শক্তি ছিল বটে। তুকচাঁদ তাকে ক্রমাগত তিনমাস ধরে খরগোশের দুধের দই, বোয়াল মাছের খিচুড়ি আর নানারকম মন্ত্রপুত ওষুধ খাওয়ায়, তবে তার শক্তি খোলে।'

এই বলিয়া বাবাজী আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে গেলেন আর এক হাতে কচ্ছপের খোলায় বেগুন পোড়া এবং অন্য হাতে একটা পাথরের বাটিতে

কিসমিসের চাটনি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন আর বলিলেন, 'বেগুনপোড়াটা আমি খাই, কিসমিসের চাটনি আপনি খান। ফকিরের বাড়ি, তাই সামান্য আয়োজন। তামাক পর্যন্ত নেই, তামাক ছেড়ে দিয়েছি। একবার খুব জোরে তামাকে টান দিয়েছিলাম, তার ফলে তামাকের ধোঁয়া বিপথে চলে গিয়ে, মস্তিষ্কের আশেপাশে সরু সরু নাড়ির মধ্যে আটকিয়ে যায়। নাসারন্ধ্রের মাঝখানে গোলকধাঁধার মত অনেকগুলি সরু সরু পথ আছে। তামাকের ধোঁয়া প্রায় একবছর পর্যন্ত সেই সব পথে ঘোরাফেরা করে, হঠাৎ একদিন হাঁচির সঙ্গে বেরিয়ে এল। তখন থেকে তামাক ছেড়ে দিয়েছি।'

বাবাজী কথা শেষ করিলেন। পূর্ণবাবু তৃপ্তিপূর্বক চাটনি খাইলেন আর বঙ্গিয়াবাবা লেবুর রস, লঙ্কা, সরিষার তৈল ও আদার কুচি দিয়া প্রচুর বেগুনপোড়া মাখিয়া খাইতে খাইতে বলিলেন 'দাঁত পড়ে গিয়েছে তাই নরম জিনিস খাই।'

আহার ও আচমন শেষ হইলে বাবাজী বলিলেন—'বাগানে কতরকম গাছ আছে, এক এক রকম গাছের এক এক রকম চেহারা, এক এক রকম বায়ু এক এক রকম ভঙ্গী, এক এক রকম আধিভৌতিক আর আধিদৈবিক প্রভাব। যেমন নিশাচর পশুপক্ষী আছে, তেমনি এক জাতীয় নিশাচর গাছ আছে, তারা রাত্রে জেগে থাকে, তাদের প্রভাব বড় খারাপ। মধুপুর স্টেশনের কাছে এইরকম একটা গাছ ছিল। পাঞ্জাব মেলের একজন ড্রাইভার প্রথম সেই গাছের অস্তিত্ব টের পায়। গাছটা সারারাত জেগে থাকত। একবার আসানসোল স্টেশন থেকে পাঞ্জাব মেল ছাড়তে দেরী হয়ে যায়। তারপর মধুপুর স্টেশনের কাছাকাছি গিয়ে লালবাতি দেখে ড্রাইভার এঞ্জিন থামায়। এঞ্জিনটা যেখানে দাঁড়ায় তার পাশেই অদ্ভুত গাছটা ছিল। গাছটা দেখেই ড্রাইভারের কেমন অভক্তি হল, গাছটার চেহারা আর ভঙ্গী বিশেষ আপত্তিজনক ছিল। একটু পরেই সে টের পেল যে গাছটার বাতাসও বড় খারাপ। কেমন যেন ঠাণ্ডা, পিছল, নিস্তেজ, আধমরা বাতাস গাছ থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। এঞ্জিনের ধোঁয়া সেই বাতাসে মিশে এক অদ্ভুত রঙের সৃষ্টি করল। ড্রাইভার দেখল যে গাছটার দুটি ডাল সোজা আকাশের দিকে উঠেছে, যেন একজন মানুষ দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দুই ডালের ডগায় একটি করে ফুল ফুটেছে। ড্রাইভার সাহসী লোক, সে গাছের আর ফুলের চেহারা দেখবার জন্য নেমে পড়ল। একজন কুলি তাকে মানা করল আর বলল যে রাত্রে ঐ গাছের কাছে যাওয়া নিরাপদ নয়। ড্রাইভার তবু এগিয়ে যেতে

লাগল। এমন সময় ট্রেন ছাড়বার হুকুম হল, তখন বাধ্য হয়ে তাকে সেই মুহূর্তেই ফিরে আসতে হল। তবে সে এইটুকু টের পেয়েছিল যে সেটা শনিমুখী ফুলের গাছ। যেমন সূর্যমুখী ফুলের গাছ আছে, তেমনি শনিমুখী ফুলের গাছ আছে। এই গাছ রাত্রে শনি গ্রহের দিকে তাকিয়ে জেগে থাকে। কোন পাখি এই গাছে বসে না। আমি আর তুকচাঁদ একবার এই গাছটা দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তখন গাছটা একেবারে বুড়ো হয়ে অত্যন্ত জড়সড় হয়ে পড়েছে।'

কথা শেষ করিয়া বাবাজী লাল নীল মোমবাতি জ্বালাইয়া সেই চৌকোনা পাথরের উপর রাখিতে লাগিলেন। তখন সূর্য ডুবিয়া গিয়াছিল।

সবগুলি বাতি জ্বালাইয়া বাবাজী বলিলেন—'একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে, তখন এইসব বাতির আলোয় নানারকম শ্লোক আর মন্ত্র পড়ব। গভীর রাত্রে আলো নিভিয়ে দেব, আর গ্রহনক্ষত্রের ভাবগতিক লক্ষ্য করব। জ্যোৎস্নারাত্রে চন্দ্রমণ্ডলের অমৃত পান করি। কাল রাত্রে একটা নক্ষত্র দেখেছিলাম, তার চেহারা আর মেজাজ মোটেই সুবিধার নয়, কিন্তু সপ্তর্ষিমণ্ডল কাছে থাকাতে সে একটু সাবধানে চলে। তিরিশ বছর এই জগতে আছি, কত কিছুই দেখলাম। শরীরের কলকব্জা আলগা হয়ে আসছে, আর এ বছর আমার ফাঁড়া আছে। গয়ার দিকে একবার বেড়াতে যাব, সেখানে ভাল ভাল ওষুধের গাছ পাওয়া যায়।'

পূর্ণবাবুর আরো কিছুক্ষণ থাকিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আর সময় ছিল না। তিনি বাবাজীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ফিরিলেন।

দুই সপ্তাহ পরে পূর্ণবাবু শুনিলেন যে রঙ্গিয়াবাবা গয়ার এক পাহাড়ে গিয়া বসিয়াছেন। বলরাম মোদকের কাছেই তিনি এই খবর পাইলেন। বলরাম রঙ্গিয়াবাবার চিঠি দেখাইল।

চিঠিখানি এইরূপ :

শ্রীবলরাম মোদক বাবাজীউ।

বাবাজীউদ্বু, আমি নিরাপদে গয়া পঁহুছিয়াছি। শহর হইতে বহুদূরে এক পাহাড়ে বাস করিতেছি। নিকটেই আমার একজন সেবক আছেন, তিনি মধ্যে মধ্যে খবর লইয়া থাকেন। চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। এখানকার নির্জন ঝাড়জঙ্গলে ও বনবাদাড়ে আবছায়ায় বেড়াইতে বড়ই আরাম। সেদিন আমার সেবকটি অনেক সাধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে নানা শ্রেণীর মহাত্মা দুরাত্মা ও প্রেতাত্মার সমাগম হইয়াছিল।

এখানকার খানাখন্দ ও গিরিকন্দরে অনেক অদ্ভুত জিনিস দেখিতে পাওয়া

যায়। নানারূপ অমৃতময় অন্নপান ও অমৃতময় দৃশ্যে পবিতৃপ্ত হইতেছি। তোমার ও পূর্ণবাবুর কুশল সংবাদ দিও। অত্র মঙ্গল। ইতি—

আশীর্বাদক—বঙ্গিয়াবাবা।

বাবাজী তাঁহাকে মনে রাখিয়াছেন দেখিয়া পূর্ণবাবু খুব সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন—'মহাপুরুষদের চিঠি লিখবাব কায়দা কিবকম। তোমাকে সুদ্ধ বাবাজীউ বানিয়ে দিয়েছেন। চিঠিটা যত্ন কবে বেখে দেওয়া উচিত।'

বলরাম বলিল—'চিঠি তো রঙ্গিয়াবাবার কৃপাব চিহ্ন, যত্ন কবে বাখবই। তবে বাবাজীর অনেক আয়ু। আমরাই তাঁব আগে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব।'

ইহার পর প্রায় একমাস পর্যন্ত বাবাজীর আর চিঠি আসে নাই। বলবাম স্থির করিল যে, বাবাজী তপস্যায় একেবারে মাতিয়া গিয়াছেন, পত্র দিবার সময় পাইতেছেন না। পূর্ণবাবুও অনেকটা তাহাই আন্দাজ করিলেন। ইহাব পর একদিন বলরাম হাসিমুখে সংবাদ দিল যে, বাবাজীব আর একখানি চিঠি আসিয়াছে। বাবাজী খুব তাড়াতাড়ি উহা লিখিয়াছেন। পূর্ণবাবু পত্রটি দেখিলেন ঃ

শ্রীবলরাম মোদক বাবাজীউ,

বাবাজীউষু, লক্ষণামূলের সন্ধানে দীর্ঘকাল পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়াছিলাম, তাই পত্র দিতে পারি নাই। গতকল্য বৈকালে বেলের লাইনের ধারে একজন মারোয়াড়ী ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে ফুলদানীতে চা খাওয়াইলেন।

চায়ের গুণ যে শুধু চা প্রস্তুত-প্রণালীর উপর নির্ভর করে তাহা নহে, পানপাত্রের উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। কচ্ছপের খোলায় চা খাইলে মনের স্থৈর্য ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধি পায়। ফুলদানীতে চা খাইলে মন প্রসন্ন হয় ও কান্তি বৃদ্ধি পায়। একটি বিশেষ সুসংবাদ দিতেছি—যে ঔষধের গাছের সন্ধান করিতেছিলাম তাহা পাইয়াছি। এই গাছের শিকড় খাইলে দীর্ঘজীবন লাভ হয়, মাংসপেশী সবল হয়। দুধের সঙ্গে এই শিকড় খাইতে হয়, কিন্তু আমার আর দেরী সহ্য হইতেছিল না। সেইখানেই কাঁচা শিকড় খাইয়া ফেলিলাম। স্থানটি আমার বাসস্থান হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূর। খাওয়ামাত্রই ঔষধের অপূর্ব গুণ বুঝিতে পারিলাম, যেই ঘরে ফিরিবার ইচ্ছা হইল অমনি মোটর গাড়ি ছাড়িবার সময় যেমন ঘর্‌ঘর্‌ ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ আর কম্প হয়, ঠিক তেমনি শব্দ আর কম্প আমার শরীরে উৎপন্ন হইল, পরমুহূর্তেই পা দুখানি ঝড়ের মত ছুটিয়া ঘরের দিকে চলিল,

কিছুই পরিশ্রম বোধ হইল না। তোমার আর পূর্ণবাবুর জন্য কিছু শিকড় রাখিয়া দিয়াছি। ইতি।

আশীর্বাদক—রঙ্গিয়াবাবা।

শিকড়ের কথা পড়িয়া বলরাম ও পূর্ণবাবু মহা আনন্দ করিতে লাগিলেন।

তিন দিন পরে রঙ্গিয়াবাবার আর একটি চিঠি পাইয়া বলরামের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। পূর্ণবাবু অফিস হইতে ফিরিতেই বলরাম তাঁহাকে চিঠি দেখাইল :

শ্রীবলরাম মোদক বাবাজীউ

বাবাজীউষু—নিতান্ত দুঃসংবাদ, হিতে বিপরীত ঘটিয়াছে। ঔষধের তেজ শরীরে সহ্য হইল না। বোধহয় কাঁচা ঔষধ খাওয়াতে এইরূপ হইয়াছে ; দুধ দিয়া পাক করিয়া খাইলে ভাল হইত। প্রথম প্রথম খুব ক্ষুধা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, শরীরে হস্তীর বল হইয়াছিল, চিন্তাশক্তি খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। পাহাড় হইতে ছুটিয়া নামিতাম, আবার ছুটিয়া উঠিতাম। ঘড়িতে চাবি দিলে যেমন ঘড়ি তাজা হইয়া উঠে, আমারও তাহাই হইয়াছিল। অসাড় জিহ্বায় সাড় আসিয়াছিল, বাকশক্তি ও ভোজনশক্তি বাড়িয়া গিয়াছিল। চর্ম মসৃণ ও উজ্জ্বল হইয়াছিল। কিন্তু দুই তিন দিনের মধ্যেই ঔষধের তেজ অসহ্য হইয়া উঠিল। এখন—

রোগ বড় গুরু, ঝরে গেছে ভুরু,
শোথ বড় পুরু, মহাযাত্রা শুরু,
ফুলে গেছে উরু, ইষ্ট নাম কুরু।

ইতি—আশীর্বাদক রঙ্গিয়াবাবা।

বলরাম খুব দুঃখের সহিত বলিল—'বাবাজী এবার দেহত্যাগ করবেন দেখছি। আমাদের মহা দুর্ভাগ্য।'

পূর্ণবাবু বলিলেন—'বাবাজীর সঙ্গে আমার অল্পকালের পরিচয়, কিন্তু তাঁর প্রতি আমার খুব ভক্তি হয়েছে, তাঁর ন্যায় সদালাপী লোক দেখিনি। তাঁর অসুখের কথা শুনে বড় দুঃখিত হলাম।'

কিছুদিন পরে বলরাম একটি খবরের কাগজ পূর্ণবাবুর হাতে দিয়া বলিল—'পরহমংস রঙ্গিয়াবাবা দেহত্যাগ করেছেন।'

পূর্ণবাবু খবরের কাগজটি খুলিয়া এই সংবাদ পাইলেন :

পরলোকে রঙ্গিয়াবাবা

স্বনামধন্য প্রেতসিদ্ধ মহাপুরুষ রঙ্গিয়াবাবা দেহ রাখিয়াছেন। ইঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, কিন্তু লোকের মঙ্গলসাধনেই ইঁহার সমস্ত শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল।

মারণ, উচাটন প্রভৃতি ক্রুর কর্মের অনুষ্ঠান ইনি করিতেন না। ইনি অনেক গাছ-গাছড়ার গুণ জানিতেন। গয়ার এক নির্জন পাহাড়ে দেহ রাখিয়া ইনি ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। ইনি এক অদ্ভুত মৃতসঞ্জীবন শিকড় আবিষ্কার করিয়াছিলেন।'

খবরের কাগজ রাখিয়া দিয়া পূর্ণবাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। রঙ্গিয়াবাবার মৃত্যুতে তিনি সত্যই দুঃখিত হইলেন। আর বলরাম রঙ্গিয়াবাবার চিঠিগুলি পরম যত্নে রাখিয়া দিল।

দধিসত্ত্ব মুনি

দধিসত্ত্ব মুনি নর্মদাতীরে তাঁহার মনোরম কুটিরে বাস করিতেন। শ্বেত পাথরের বেদীতে শাদা কম্বলের আসনে বসিয়া তিনি ধ্যান করিতেন। চুল দাড়ি গোঁফ কামাইয়া মাথায় ঘাড়ে আর মুখে দই মাখিয়া তিনি ধ্যানে বসিতেন। সকালে একটি শ্বেত পাথরের বাটিতে ঘোলের সরবৎ রাখিয়া তাহাতে একটি শ্বেত পদ্ম ভাসাইয়া দিতেন। দুই তিন ঘণ্টা পরে ধ্যান হইতে উঠিয়া সেই ঘোল পান করিতেন। তিন সপ্তাহ পরে তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন। উৎসাহের চোটে তিনি আরও তিন বৎসর এই সাধনা অভ্যাস করিলেন।

তপস্যার প্রভাবে দধিসত্ত্ব মুনির শরীরমন বড়ই স্নিগ্ধ হইল। দিনের বেলায় তাঁহার ঘাম হইত না; রাত্রিতে বড়ই আরামে নিদ্রা হইত। এখন তিনি গ্রামে গ্রামে শিষ্য খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই সাধনার ফল কি?' মুনি বলিলেন, 'এক সপ্তাহে শরীরমন জুড়াইয়া যাইবে, দুই সপ্তাহে অপূর্ব কান্তি হইবে, তিন সপ্তাহে তালুমূলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইবে, মস্তক ভেদ করিয়া জ্যোৎস্নারাশি বাহির হইবে। তখন নিজেরা তো যারপর নাই আরামবোধ করিবেই, অন্যেও তোমাদের প্রশংসা করিবে এবং তোমাদের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিবে। ঘোর গ্রীষ্মেও তোমাদের কষ্ট হইবে না। উন্মাদ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগে কখনও ভুগিতে হইবে না। মাথায় রক্ত উঠিবে না। বিশেষত নাসা, ব্যঙ্গ এবং নীলী রোগে কখনও কষ্ট পাইতে হইবে না। লম্বজিহ্বতা, গলগ্রহ এবং হনুমন্যাদির বিকৃতি সারিয়া যাইবে। তখন এমন সুন্দর চেহারা হইবে যে, সিংহব্যাঘ্রও তাহা দেখিয়া হিংসা ভুলিয়া আরামে চক্ষু বুজিয়া ফেলিবে।'

মুনির পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা শুনিয়া এবং সহাস্য বদন ও স্নিগ্ধ কান্তি দেখিয়া পনের জন লোক তাঁহার শিষ্য হইল। যাহারা হইল না তাহারাও বলিল, 'ভাবিয়া দেখিব।' শিষ্যেরা চুল দাড়ি গোঁফ কামাইয়া দই মাখিয়া গুরুর সহিত ধ্যানে বসিল। প্রথম দিনই পাঁচজন শিষ্য বলিল, 'মুনি ঠাকুর, আর তো দই মাখিয়া সাধনা করিতে পারিনা; মুখের চারিদিকে বড়ই মাছি ভনভন করিতেছে।' মুনি মনে মনে দুঃখিত হইলেও বলিলেন, 'তোমাদের যখন এতই কষ্ট হইতেছে তখন

তোমরা যাইতে পার।' সেই পাঁচজন চলিয়া গেল। অবশিষ্ট দশজন শিষ্য উৎসাহের সহিত তপস্যা করিতে লাগিল। এক সপ্তাহ পরে আরও পাঁচজন বলিল, 'গুরো! মাথা যে পচিয়া গেল। দই মাখিয়া মাখিয়া অসহ্য চুলকানি হইয়াছে।' মুনি ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, 'তোমরাও যাইতে পার।' অবশিষ্ট পাঁচজন মুনির উপর নির্ভর করিয়া তপস্যা চালাইতে লাগিল। মুনি তাহাদিগকে বলিলেন, 'বৎসগণ, দ্বিতীয় সপ্তাহ আরম্ভ হইয়াছে, এইবার তোমাদের দিব্য কান্তি লাভ হইবে।'

দ্বিতীয় সপ্তাহ শেষ হইলে শিষ্যদের মধ্যে তিনজন বলিল, 'গুরুজী, ঠাণ্ডা লাগিয়া লাগিয়া আমাদের সর্দি লাগিয়া গেল; আর তো দই মাখা চলে না।' মুনি বলিলেন, 'মাথা ঠাণ্ডা করিবার জন্যই তো এত আয়োজন করিয়াছি তোমাদের যদি সহ্য না হয় তবে বুঝিতে হইবে তোমরা আমার শিষ্য হইবার যোগ্য হও নাই।'

সেই তিনজন চলিয়া গেল। অবশিষ্ট দুইজন শিষ্যকে মুনি বলিলেন, 'তোমাদের উৎসাহের প্রশংসা করি। আর সাত দিন ধ্যান কর, মহাসিদ্ধি লাভ হইবে, তালুমূলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইবে।' ছয় দিনের পর দুই শিষ্যের একজন বলিল, 'গুরুদেব, তালুমূলে চন্দ্রোদয় হইয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই চন্দ্রে গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং আমি চলিলাম।'

পরদিন শেষ শিষ্যকে মুনি বলিলেন, 'বৎস, আর একদিন মাত্র। যে দিনের জন্য আমরা এতকাল অপেক্ষা করিতেছিলাম আজ সেই মহাদিন। চল, আমরা ঐ ধানক্ষেতে বসিয়া ধ্যান করি।' গুরুশিষ্যে ধানক্ষেতে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। ৩।৪ টি বালক লাঠি হাতে সেখানে খেলা করিতে আসিল। তাহারা গুরুশিষ্যের দইমাখা মাথা দেখিয়া বলিল, 'দেখ, কে হাঁড়িতে চুন মাখাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। লাঠি দিয়া হাঁড়ি ফাটাইয়া দিলে বেশ হয়।' এই বলিয়া তাহারা গুরু ও শিষ্যের মাথায় লাঠি দিয়া মারিল। শিষ্য লাফ দিয়া পলাইয়া গেল। মুনিও মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে উঠিয়া পড়িলেন। বালকগণ লজ্জায় দূরে সরিয়া গেল। মুনি আর ইহার পর শিষ্য সংগ্রহ করেন নাই।

শয়তানের মোটরগাড়ী
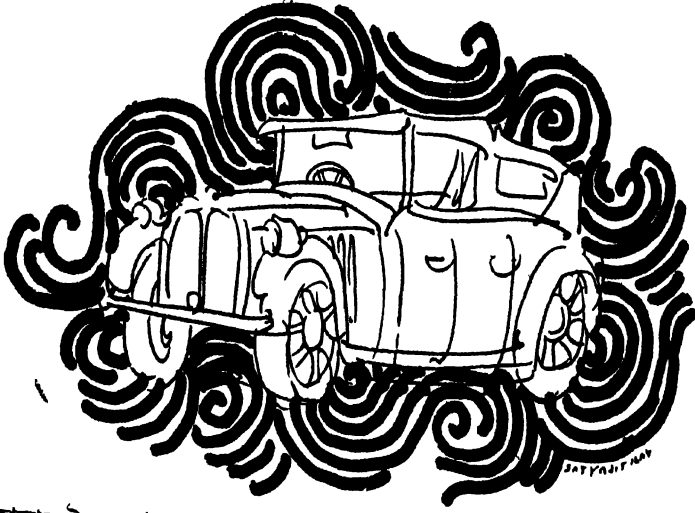
কলিকাতার উত্তর-পূর্ব কোণে খালপারের কাছে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসুর প্রকাণ্ড বাড়ি। রমেশবাবু এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ; এক সময়ে তিনি একজন পাকা দালাল আর হিসাবনবীশ ছিলেন। তিনি অনেক টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন।

রমেশবাবুর একমাত্র পুত্র প্রকাশচন্দ্রের বয়স ২৫ বৎসর। তিনি পিতার সঙ্গে কলিকাতার বাড়িতেই থাকেন। রমেশচন্দ্র যে কাজ করিতেন, প্রকাশচন্দ্র এখন সেই কাজ করিতেছেন। দালালীর কাজে প্রকাশবাবুকে অনেক জায়গায় ঘুরিতে হয়। আগে যাঁহারা রমেশবাবুকে দিয়া কাজ করাইতেন, এখন তাঁহারা প্রকাশ-বাবুর হাতে কাজ দিতেছেন। রমেশবাবুর একখানি অতি পুরাতন মোটর গাড়ী ছিল, প্রকাশবাবু এখন সেটি ব্যবহার করিতেছেন। মোটরের আয়ু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, অনেকবার মেরামত করিয়াও সেটি ভাল কাজ করিতেছিল না। প্রকাশবাবু খুব উৎসাহী লোক, তাড়াতাড়ি কাজ করা তাঁহার অভ্যাস। সুতরাং এই আধমরা মোটর গাড়ীর উপর তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। সস্তায় মোটর কিনিবার আশায় তিনি প্রত্যেকদিন খবরের কাগজে মোটরের বিজ্ঞাপন দেখিতেন। শেষে তাঁহার গাড়ীটি একেবারে অকেজো হইয়া পড়িল। তিনি মোটরের জন্য খুব ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন আর একটি ভাল মোটরের বিজ্ঞাপনও দেখিলেন। কলিকাতার দক্ষিণে, বালিগঞ্জে, মিস্টার পি ডি গোমেস সস্তায় একটি মোটর গাড়ী বিক্রয় করিতে চাহেন।

প্রকাশবাবু এক টুকরা কাগজে সাহেবের ঠিকানা লিখিয়া রাখিলেন আর সেইদিনই বিকালে ঠিকা গাড়ী করিয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। ইহার আগেও প্রকাশবাবু মধ্যে মধ্যে বালিগঞ্জ গিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সাহেবের বাড়ির রাস্তা তিনি কখনও দেখেন নাই। ঠিকাগাড়ীর গাড়োয়ান বলিল যে সাহেবের বাড়ির রাস্তা তাহার জানা আছে। প্রকাশবাবু গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন আর গাড়ী ছুটিয়া চলিল। বালিগঞ্জের অনেক অজানা রাস্তা আর গলি দিয়া গাড়ী প্রায় চল্লিশ মিনিট চলাফেরা করিল, তবু পথ শেষ হইল না। প্রকাশবাবু নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন; পথের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন নাই। গাড়ী তখন বালিগঞ্জের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। একটা ময়লা পুকুরের ধারে আসিয়া গাড়ী থামিল, গাড়োয়ান তখন স্পষ্টই স্বীকার করিল যে সে পথ ভুলিয়া গিয়াছে।

তখন সূর্য ডুবিয়া আসিতেছিল। আকাশের চেহারা দেখিয়া প্রকাশবাবু দিক স্থির করিলেন। সম্মুখে, দক্ষিণ দিকে সেই পুকুর; ডানধারে বরাবর পশ্চিমে একটা মেটে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। পুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি প্রকাণ্ড নিমগাছ আর ভগ্ন মসজিদ; তাহার পাশ দিয়াই এই রাস্তাটি গিয়াছে। প্রকাশ-বাবু গাড়োয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন পাহারাওয়ালা সেখানে উপস্থিত হইল। প্রকাশবাবু তাহাকে সাহেবের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পাহারাওয়ালা বামদিকের রাস্তা দেখাইয়া বলিল যে সেই রাস্তা দিয়া নিমগাছ আর মসজিদ পার হইয়া বরাবর দক্ষিণে গেলে সারিসারি বাগানবাড়ি দেখা যাইবে। সাহেবের বাড়িও সেইখানে। পাহারাওয়ালার নির্দেশমত গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া চলিল। মসজিদের পাশ দিয়া যাইবার সময় প্রকাশবাবু দেখিলেন যে, একজন দীর্ঘকায় বলবান মুসলমান সেইখানে নমাজ পড়িতেছে, তাহার মুখে চাপদাড়ি। পাঁচ-সাত মিনিট পরেই সারিসারি পুরাতন বাড়ি দেখা গেল। দুই তিনটি বাড়ি দেখিয়া মনে হইল যে, তাহাতে লোক নাই; বাড়িগুলির বাগান শুকনা পাতায় ও ঘাসে ভরিয়া গিয়াছে। কতকগুলি বাড়ির সুরকি খসিয়া পড়িয়াছে, ছাতে ও বারান্দায় দলে দলে পায়রা বসিয়া আছে। আবার কতকগুলি বাড়ি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, লোকজন আছে।

অবশেষে, একটি বাড়ির ফটকে মিস্টার পি ডি গোমেসের নাম দেখা গেল। প্রকাশবাবু গাড়ী থামাইয়া বাড়িতে ঢুকিলেন। বাগানের ভিতর বাড়ি। বাগানের ফটক হইতে বাড়ির সামনের বারান্দা পর্যন্ত সোজা রাস্তা গিয়াছে।

বাগানের দরজার পাশে একজন নেপালী চাকর বসিয়াছিল। সে প্রকাশবাবুকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কথা বলিল না। প্রকাশবাবু সোজা বাড়িতে গেলেন ; বারান্দায় কতগুলি চেয়ার ছিল, তাহারই একটাতে বসিয়া পড়িলেন। বাড়ি নিঃশব্দ, নির্জন ; নেপালী দ্বারবানটি নির্বিকারভাবে বাগানের দরজায় বসিয়া আছে, কিছু জিজ্ঞাসাও করে না। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সাহেবের খানসামা মোবারক আলি বাড়ি ফিরিল। যে মুসলমানটিকে প্রকাশবাবু পথের ধারে নমাজ পড়িতে দেখিয়াছিলেন, এ সেই লোক। প্রকাশবাবু তাহাকে সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ; মোবারক সাহেবকে খবর দিতে গেল। প্রায় দশ মিনিট কাটিয়া গেল, প্রকাশবাবু মনে মনে বলিলেন, 'ভূতের বাড়িতে এলাম নাকি ?'

এমন সময় মিস্টার গোমেস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেবের মুখে কাঁচাপাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ; একটিমাত্র চক্ষু, অপরটি বসন্তরোগে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ আছে। প্রকাশবাবু দেখিলেন যে, কথা বলিবার সময়ে সাহেবের চক্ষু ক্রমাগত মিটমিট করে।

প্রকাশবাবুর আগমণের কারণ শুনিয়া সাহেব তাঁহাকে বাগানের এক কোণে মোটরের ঘরে লইয়া গেলেন। সেই নেপালী দ্বারবান মানবাহাদুর আসিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া দিল। ঘরে ঢুকিয়াই মোটরের চেহারা দেখিয়া প্রকাশবাবুর মন একটু দমিয়া গেল। কে যেন খাবলাইয়া খাবলাইয়া রং তুলিয়া ফেলিয়াছে। স্থানে স্থানে মোটরের সবুজ রঙের বদলে হলদে আর বাদামী মিশিয়া বীভৎস রং হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে মোটরটির অবস্থা ভালই ছিল। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য প্রকাশবাবু মোটরের খুব কাছে গেলেন, আর সেই মুহূর্তেই একটা অবর্ণনীয় গন্ধ পাইলেন ; তাহাতে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ দুই আছে। গন্ধটি নাসারন্ধ্র দিয়া অবাধে মস্তিষ্কের গোপনতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া, তিন মিনিট পর্যন্ত তথায় রাজত্ব করিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। প্রকাশবাবু এ পর্যন্ত যতরকম গন্ধ শুঁকিয়াছেন, তাহার সহিত এই গন্ধের কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। গন্ধটি শুঁকিলেই মনে একপ্রকার ভয়ের সঞ্চার হয়।

প্রকাশবাবু কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। সাহেব এতক্ষণ প্রকাশবাবুর দিকে তাকাইয়া চোখ মিটমিট করিতেছিলেন। তিনি প্রকাশবাবুর অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, গন্ধের জন্য চিন্তিত হইবার কারণ নাই। তিনদিনের মধ্যেই তিনি নূতন রং লাগাইয়া দিবেন, আর নূতন রং দিলেই গন্ধ দূর হইবে।

সাহেবের আশ্বাসবাণীতে প্রকাশবাবুর ভরসা হইল। বিশেষত দাম অত্যন্ত সুবিধাজনক হওয়াতে প্রকাশবাবু কথা দিলেন যে তিনি দুইদিন পরে আবার আসিবেন। মানবাহাদুরের মুখে একটি ক্ষীণ হাস্যরেখা আবির্ভূত হইয়াছিল, সে যেন মনে মনে কি একটা কৌতুক অনুভব করিতেছিল।

প্রকাশবাবু কথামত দুইদিন পরে আবার আসিলেন। মোটরের চেহারা তখন বদলাইয়া গিয়াছে, গন্ধও নাই। সাহেব মোটরের দাম আটশত টাকা লইলেন। প্রকাশবাবু মোটরে উঠিলেন, ড্রাইভার গোবিন্দ মোটর চালাইতে লাগিল।

আনন্দে গোমেস সাহেবের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির লোম খাড়া হইয়া উঠিল, তাঁহার টাক দিয়া আলো বাহির হইতে লাগিল, তাঁহার একটি মাত্র চক্ষু অত্যন্ত দ্রুত মিটমিট করিতে লাগিল। মানবাহাদুর আর মোবারক কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ফিসফিস করিয়া কি বলিতেছিল।

ফিরিবার পথে প্রকাশবাবুর মোটর যখন সেই মসজিদ আর নিমগাছের কাছে আসিয়াছে তখন একজন লোক তাঁহাকে থামিতে ইসারা করিল। গোবিন্দ মোটর থামাইল। প্রকাশবাবুর প্রশ্নের উত্তরে সেই লোকটি বলিল, 'আজ্ঞে, আমি আবদুল ; সাহেবের বাগান ঝাঁট দেওয়া আমার কাজ। বাগানের কোণে যে টিনের ঘর আছে, সেখানেই থাকি। আপনি এই মোটর নিবেন না, এটাকে শয়তানে চেটেছে! আমি নিজে স্বপ্নে তা দেখেছি। আপনি কি এটার গায় শয়তানের গন্ধ পান নি? একদিন রাতের খাওয়া শেষ করে কলতলায় বাসন মাজতে বসেছি, এমন সময় মোটর গাড়ীর ঘরের পাশে কি একটা নড়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বাসন মেজে পালিয়ে এলাম। তারপর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম একটা কালো, লম্বা ভূত গাড়ীটাকে চেটে চলে গেল। পরদিন গাড়ীটার রং বদলে গেল, আর নরকের গন্ধ পাওয়া গেল!'

আবদুলের কথা শুনিয়া প্রকাশবাবু বলিলেন,—'আমার কাছে খুব ভাল মাদুলি আছে, ভূতে কিছু করবে না।'

তারপর গোবিন্দ আবার মোটর চালাইয়া দিল। গাড়ী ক্রমে লোয়ার সার্কুলার রোডে আসিয়া পড়িল। ইলিয়ট রোডের মোড়ের কাছে আসিয়া প্রকাশবাবু লক্ষ্য করিলেন যে, প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে একটি ট্যাক্সি তাঁহার মোটরের পিছন পিছন আসিতেছে। উহাতে একজন বৃদ্ধ ইংরেজ আরোহী বসিয়াছিলেন, তাঁহার দিকেই বিশেষভাবে প্রকাশবাবুর দৃষ্টি গেল। বৃদ্ধের পরিধানে কোট পাৎলুন, কিন্তু মাথায় পাগড়ী! মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চেহারা ভাল দেখা

যাইতেছিল না। এক মিনিট বৃদ্ধের দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া প্রকাশবাবু দৃষ্টি ফিরাইলেন, এবং এদিক-ওদিক তাকাইতে তাকাইতে বৃদ্ধের কথা ভুলিয়া গেলেন।

বাড়ি পৌঁছিয়া প্রকাশবাবু দেখিলেন যে সেই ট্যাক্সি বৃদ্ধ ইংরেজ ভদ্রলোকটিকে লইয়া তাঁহার বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধটি পাগড়ী দিয়া মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি অল্প অল্প দেখা যাইতেছিল। তাহা দেখিয়া প্রকাশবাবুর বারবার পি ডি গোমেসের কথা মনে হইতেছিল!

নূতন মোটরটি প্রকাশবাবুর খুব পছন্দ হইল। বিশেষত এই মোটর কিনিবার পর তাঁহার কাজের কিছু উন্নতি হইল। আর মোটরের সঙ্গে শয়তানের কাহিনী জড়িত আছে বলিয়া তিনি বেশ কৌতুক অনুভব করিতেন। কিন্তু ড্রাইভার গোবিন্দ এই মোটরের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না। তাহার বিরক্তির একটা কারণও ছিল। একদিন শেষ রাতে গোবিন্দের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল আর সে দেখিতে পাইল যে মোটরগাড়ীর ঘর হইতে একটু একটু আলো বাহির হইতেছে। চোর আসিয়াছে মনে করিয়া গোবিন্দ মোটরের ঘরের কাছে দৌড়িয়া গেল, আর একটা অদ্ভুত গন্ধ তাহার নাকে ঢুকিল। মোটর কিনিবার সময় যে গন্ধ পাওয়া গিয়াছিল, সেইরূপ। গোবিন্দের ভয় হইল। সে দ্বারবান হনুমান সিংকে ডাক দিল, এবং দুইজনে একসঙ্গে সেই ঘরে ঢুকিল। তখন আলো নিবিয়া গিয়াছে, কিন্তু গন্ধ অল্প অল্প পাওয়া যায়। ঘরের পশ্চিমের জানালা খুলিয়া কেহ ঘরে ঢুকিয়াছিল বলিয়া মনে হইল। সকাল হইলে প্রকাশবাবুকে সব কথা বলা হইল।

এই ঘটনায় গোবিন্দ ও হনুমান সিং খুব চিন্তিত হইল। কিন্তু প্রকাশবাবু কিছুমাত্র ব্যস্ত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন উহা গোবিন্দের মনের ভ্রম।

কিন্তু ইহার এক সপ্তাহ পরে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে প্রকাশবাবুর ভাবনা হইল। প্রকাশবাবুর পিতা রমেশবাবু প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় উঠিয়া বাগানের দক্ষিণে একটি ছোট ঘরে বসিয়া মালা জপ করিতেন। সেই দিনও অভ্যাসমত ভোরে উঠিয়া মালা হাতে ঘরের দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, বাগানের পশ্চিমে মোটর ঘরের পিছনের দেওয়ালের উপর দিয়া একটা বীভৎস মুখ উঁকি মারিতেছে। গ্যাসের বাতির আলো সেই মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। রমেশবাবু হাতের মালা শক্ত করিয়া ধরিলেন এবং বিকৃতস্বরে 'কেও? কেও?' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ আর হনুমান সিং তৎক্ষণাৎ

ছুটিয়া আসিল। সেই বীভৎস মূর্তিটি তখন দেওয়ালের পিছনে সরিয়া পড়িল। পরে মোটরের ঘর খোলা হইলে আবার সেই অদ্ভুত গন্ধ পাওয়া গেল!

ইহার পাঁচ ছয়দিন পরে প্রকাশবাবু খিদিরপুরে তাঁহার বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণ খাইয়া উঠিতে উঠিতে রাত্রি এগারোটা বাজিল। ফিরিবার সময়ে প্রকাশবাবু গোবিন্দকে বলিলেন, 'মোটরটাকে গড়ের মাঠে ঘুরিয়ে নিয়ে চল। একটু হাওয়া খাওয়া যাবে, আজ বড় গরম।'

রেড রোড দিয়া মোটরগাড়ী ধীরগতিতে চলিয়াছে, প্রকাশবাবু আনন্দে বিভোর। তাঁহার একটু একটু ঘুম পাইতেছিল, এমন সময় খট করিয়া মোটর গাড়ীর পিছনে একটি শব্দ হইল। প্রকাশবাবু উহা গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু পরমুহূর্তেই সেই অতি পরিচিত গন্ধ যাহাকে আবদুল বলিয়াছিল শয়তানের গন্ধ—প্রকাশবাবুর নাকে ঢুকিল। তিনি চমকাইয়া মাথা ফিরাইতেই দেখিতে পাইলেন একটি লোক গাড়ীর পা-দানের উপর বসিয়া আছে। তাহার মুখ অত্যন্ত বিকট! মুখের চামড়া খুব মোটা আর সবুজ, কিন্তু হাত দুখানি ফরসা। প্রকাশবাবু ধড়ফড় করিয়া উঠিতেই গোবিন্দ মুখ ফিরাইল। লোকটি গাড়ীর পা-দান হইতে লাফাইয়া পড়িয়া গড়ের মাঠের ভিতর চলিয়া গেল। গোবিন্দ লোকটিকে ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই, কিন্তু গন্ধ পাইয়াছিল।

বাড়ি ফিরিয়া প্রকাশবাবু দেখিলেন, লোকটি যেখানে বসিয়াছিল সেখানে মোটরের রং বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। গন্ধ তখনও ছিল। প্রকাশবাবুর পিতা সব কথা শুনিয়া প্রকাশবাবুকে সতর্ক করিয়া দিলেন, এবং মোটরখানি বেচিয়া ফেলিতে অথবা সাহেবের কাছে ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। হনুমান সিং আর গোবিন্দরাও বারোটা পর্যন্ত জাগিয়া সেই দিনের ঘটনা লইয়া আলোচনা ও তর্ক করিল।

প্রকাশবাবু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও মোটরটি বেচিতে পারিলেন না। অগত্যা একদিন কাজকর্ম শেষ করিয়া সাহেবকে মোটরখানি ফিরাইয়া দিতে গেলেন। গিয়া দেখেন সাহেব বারান্দায় বসিয়া সন্ধ্যার শীতল বায়ু সেবন করিতেছেন। প্রকাশবাবুকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া আসিলেন। প্রকাশবাবু তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। প্রকাশবাবুর কথা শেষ হইলে সাহেবের একটিমাত্র চক্ষু আস্তে আস্তে বুজিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে তিনি গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গেলেন। প্রায় পাঁচমিনিট পরে সাহেবের ধ্যানভঙ্গ হইল এবং তাঁহার চক্ষু অনবরত মিটমিট করিতে লাগিল। তিনি মোটরটি ফিরাইয়া লইতে এবং পাঁচশত টাকা ফিরাইয়া

দিতে রাজি হইলেন। সব কাজ শেষ করিয়া প্রকাশবাবু একখানি ঠিকা গাড়ীতে বাড়ি ফিরিলেন।

প্রকাশবাবুর বন্ধুদের মধ্যে অনেকের ধারণা হইয়াছিল যে এই সব ভৌতিক ঘটনার মূলে গোমেস সাহেবের হাত আছে। একজন স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, 'সাহেবের মিটমিটে চোখ দেখলেই বোঝা যায় সে যে কত বড় শয়তান।' আর একজন বলিলেন, 'প্রকাশ যেদিন মোটর কিনে নিয়ে আসল, সেদিন যে সাহেব ট্যাক্সি চড়ে পেছন পেছন এসেছিল সে ঐ শয়তান গোমেস ছাড়া আর কেউ নয়।' আর একজন বলিলেন 'না-হে, গোমেস সাহেবের খুব সুনাম আছে।'

একদিন সকালে প্রকাশবাবু খবরের কাগজ হাতে লইয়া এই খবর দেখিতে পাইলেন ঃ—

ভৌতিক ঘটনা

কণ্ট্রাক্টর গোমেস সাহেবের অদ্ভুত মৃত্যু

বালিগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টর মিস্টার পি ডি গোমেস গত বৎসর হইতে হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। গত বুধবার রাত্রির আহার শেষ করিয়া বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে একটি ভীতিজনক দৃশ্য দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়েন। তিনি ভীরু ছিলেন না, কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা থাকায় সহজেই মূর্ছা হইয়াছিল। জ্ঞান হইলে তিনি বলিলেন যে, তিনি মোটরের ঘরের কাছে একটি ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখিয়াছেন। একঘণ্টা পরে তিনি আবার মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

খবরের কাগজ পড়িয়া প্রকাশবাবু বুঝিলেন যে, গোমেস সাহেব সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন, ভৌতিক ঘটনার মূলে তাঁহার কোনই হাত ছিল না। ইহার পর হইতে গোমেস সাহেবের বাড়ির রাস্তায় সন্ধ্যার পর কেহ সহজে যাইতে চাহিত না। একদিন কনস্টেবল তেওয়ারী সেই রাস্তায় পাহারা দিতে দিতে গোমেস সাহেবের পাশের বাড়ির পাঁচিলের নিচে একটু দাঁড়াইয়া দোক্তায় চুন মিশাইতেছিল, হঠাৎ সেই বীভৎস মূর্তিটি পাঁচিলের উপর হইতে থাবা মারিয়া দুধনাথের পাগড়ী কাড়িয়া লইল এবং পাঁচিলের উপর দিয়া দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। দুধনাথ ঠাণ্ডা ও নিরীহ প্রকৃতির লোক, কিন্তু তাহার যথেষ্ট সাহস ছিল। প্রতিজ্ঞা করিল, যে করিয়াই হউক এই ভূতকে সে ধরিবে। গোমেস সাহেবের খানসামা মোবারক ও দারবান

মানবাহাদুর তখনও গোমেস সাহেবের বাড়িতে ছিল। তাহারাও খুশি হইয়া তুধনাথের সঙ্গে যোগ দিল। কিন্তু প্রথম তিনরাত্রি ভূতের দেখা পাওয়া গেল না।

গোমেস সাহেবের পাশের বাড়িতে লোক থাকিত না। তিন চার মাস ধরিয়া বাড়িটি খালি অবস্থায় পড়িয়াছিল। বাড়ির বাগান শুকনা পাতা আর আগাছায় ভরিয়া গিয়াছিল। চতুর্থ রাত্রিতে তুধনাথ সেই বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়াছিল, আর মানবাহাদুর ও মোবারক কুড়ি হাত দূরে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিল, এমন সময় তুধনাথের কপালে একটা চটচটে তরল পদার্থের ছিটা আসিয়া লাগিল। তাহার গন্ধে তুধনাথের মাথা ঘুরিয়া গেল। তাহার কথা বলিবার শক্তি রহিল না। তুই হস্তে ব্রহ্মতালু চাপিয়া ধরিয়া নাকমুখ সিঁটকাইয়া সে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া মানবাহাদুর আর মোবারক দৌড়াইয়া আসিল। আসিয়াই তাহারা দেখিল যে সেই জনশূন্য বাড়ির বাগানের ভিতর একটি বিকটাকার মানুষ হামাগুড়ি দিয়া যাইতেছে। ততক্ষণে তুধনাথের হুঁস হইয়াছে। তাহারা তিনজনে মিলিয়া পাঁচিল টপকাইয়া বাগানে ঢুকিয়া সেই ভৌতিক মানুষ-টিকে ধরিতে গেল। অদ্ভুত মানুষটিও তখন দৌড়াইয়া সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকিল, আর ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। উপরের একটি ঘরের জানালা ভাঙ্গা ছিল। মোবারক সেখানে মই লইয়া উঠিতে চাহিল। মানবাহাদুর গোমেস সাহেবের বাড়ি হইতে মই আনিতে গেল, মোবারক আর তুধনাথ সেই অদ্ভুত মানুষটিকে পাহারা দিতে লাগিল।

মানবাহাদুর মই আনিয়া জানালায় লাগাইল। মোবারক মই দিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু কিছুদূর উঠিতেই সেই প্রাণঘাতী গন্ধ-বিশিষ্ট চটচটে তরল পদার্থের ছিটা লাগিয়া মোবারকের দাড়ি শিহরিয়া উঠিল। মোবারক গন্ধে অভিভূত হইয়া উঠিতেও পারেনা, নামিতেও পারেনা, কেবল 'এঃ! এঃ! এঃ! সেরেছে! সেরেছে! হতভাগা শয়তানে সেরেছে!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন মোবারক আলিকে নামাইয়া মানবাহাদুর মই দিয়া উঠিতে লাগিল; তাহার মাথায় ও ঘাড়ে সেই অপরূপ পদার্থটি পড়িতে লাগিল। সে গন্ধে অভিভূত হইয়া ও রাগে দাঁত কড়মড় করিতে করিতে অদম্য তেজের সহিত মই দিয়া উঠিতে লাগিল। সকলেই দেখিল সেই ভূতের মত মানুষটি জানালার ধারে দাঁড়াইয়া একটি শিশি হইতে সেই পদার্থটি মানবাহাদুরের মাথায় ঢালিতেছে। মানবাহাদুর জানালায় পৌঁছিয়াই সেই মানুষটির কান খামচাইয়া ধরিয়া খুব জোরে

টান দিল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা মুখোস খুলিয়া আসিল। তখন সকলেই দেখিল একজন ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা সাহেব জানলায় দাঁড়াইয়া আছে, তাঁহার চক্ষু দুইটি ঘনঘন মিটমিট করিতেছে। গোমেস সাহেবের সঙ্গে সেই চেহারার সাদৃশ্য দেখিয়া সকলেই চমকাইয়া উঠিল; কিন্তু গোমেস সাহেবের একটি মাত্র চক্ষু ছিল, আর ইহার দুইটি চক্ষু। এবং ইহার মুখে বসন্তের দাগ নাই। মানবাহাদুরের সঙ্গে এই ব্যক্তির ভীষণ কুস্তি বাধিয়া গেল। দুই তিন মিনিটে মোবারক আর দুধনাথও সেখানে উপস্থিত হইল, এবং তিনজনে মিলিয়া অনেক ধস্তাধস্তির পর সাহেবকে বন্দী করিল। তখনই থানায় খবর গেল।

পরদিন সকালে একজন পুলিশ কর্মচারী সেই বাড়িতে আসিয়া অনেকগুলি শিশি এবং একখানি খাতা দেখিতে পাইলেন। শিশিগুলিতে হিং, কডলিভার অয়েল, দেলখোস, তার্পিন তেল, রসুন, আয়োডিন, মৃগনাভী, কার্বলিক এসিড, কর্পূর, কেরোসিন, গোলাপজল এবং নানারূপ রাসায়নিক দ্রব্য রহিয়াছে। আবার এই সমস্ত দ্রব্য একসঙ্গে মিশাইয়া একটি বড় বোতলে রাখা হইয়াছে; বোতলের গায়ে লেখা 'perfumed motor polish'। এই অপূর্ব দ্রব্যের গন্ধ শুঁকিয়া বোঝা গেল যে ইহাই প্রকাশবাবুর মোটরে, দুধনাথের কপালে, মোবারকের দাড়িতে এবং মানবাহাদুরের মাথায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

খাতাখানিতে লেখা—মিঃ এম ডি গোমেস; ইনি মৃত গোমেস সাহেবের ভাই। ইনিই এখন মানবাহাদুর ও মোবারকের হাতে বন্দী হইয়া আছেন। ইনি বহু বৎসর পূর্বে উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইয়া পাগলা গারদে আবদ্ধ ছিলেন; পরে মাথা ঠিক হইলে মুক্তি পাইয়াছিলেন। তারপর ইনি কলিকাতায় চাকুরি লইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি একবার মাত্র তাঁহার ভাই পি ডি গোমেসের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। মোবারক আর মানবাহাদুর তখন বাড়িতে ছিল না, তাই তাহারা তাহাদের মনিবের ভাইকে দেখে নাই। ইহার কিছুকাল পরে এম ডি গোমেস আবার পাগল হইয়া যান, এবং পি ডি গোমেসের পাশের বাড়িটি খালি পাইয়া সেখানে সকলের অজ্ঞাতসারে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত সতর্কভাবে চলাফেরা করিতেন। এই সময়ে তিনি এই অপূর্ব গন্ধদ্রব্যটি প্রস্তুত করেন। তিনি মনে করিতেন যে উহা অতি উৎকৃষ্ট মোটর পালিশ এবং এই পালিশে মোটরের রং ভাল হইবে এবং সুগন্ধও হইবে। তিনি লুকাইয়া লুকাইয়া রাত্রে তাঁহার ভাই-এর মোটরের উপর ইহার পরীক্ষা চালাইতেছিলেন। তাহার ফল কিরূপ ভীতিজনক হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আব্দুল

বাসন মাজিতে গিয়া ভয় পাইয়াছিল। তিনিই প্রকাশবাবুর পিছন পিছন ট্যাক্সি করিয়া গিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে তিনি একটি বিকট মুখোস ব্যবহার করিতেন। তাঁহাকে দেখিয়াই রমেশবাবু ভয় পাইয়াছিলেন। গড়ের মাঠে প্রকাশবাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে হইয়াছিল।

এম ডি গোমেসের খাতাখানি পুলিশ কর্মচারী মহাশয় অত্যন্ত যত্নের সহিত পড়িলেন। খাতাটি একটি ডায়রি, অর্থাৎ দৈনিকলিপি। পাগল সাহেব সেই জনশূন্য বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিবাব পব প্রতিদিন যে সকল কর্ম করিতেন তাহা এই খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

পুলিশ কর্মচারী সাহেবকে থানায় লইয়া গেলেন। সাহেবকে আবার পাগলা গারদে যাইতে হইল; সেখানে তাঁহাব চিকিৎসা চলিতে লাগিল। মোবারক এক হোটেলে কাজ লইয়াছে। সেই গন্ধদ্রব্যের সংস্পর্শে তাহার দাড়ির রং বদলাইয়া গিয়াছিল—সুতবাং তাহাকে তিনবার দাড়ি কামাইয়া ঔষধ লাগাইতে হইয়াছিল। এখন দাড়ির রং স্বাভাবিক হইয়াছে। মানবাহাদুর নেপালে ফিরিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মনারায়ণ খাঁ

যেদিন সকালে ব্রহ্মনারায়ণ খাঁ মশাই ছদ্মবেশে কলকাতা শহরে ঢুকলেন, সেদিনের কথা আজ পর্যন্ত কেউ ভুলতে পারেনি। রাস্তার দু ধারে ফুটপাথে লোক জমা হয়ে গেল; বাড়িগুলোর দরজায় দরজায়, রোয়াকে রোয়াকে, বারান্দায় বারান্দায়, ছাতে ছাতে লোক, রাস্তার বাতিগুলোর থামে থামে কারা যেন উঠেছে। কেউ কেউ প্রথমে ভয় পেলেও খাঁ মশাইয়ের হাসিমুখ দেখে আবার এগিয়ে এল। একজন পুলিশ হাই তুলতে গিয়ে হঠাৎ ব্রহ্মনারায়ণ খাঁকে দেখতে পেয়ে মুখ হাঁ করেই রইল; তার হাই ফুরিয়ে গেল, কিন্তু মুখের হাঁ বন্ধ হল না।

একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'দেখুন, আপনি কি মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছেন?' খাঁ মশাই বললেন, 'না, আমি কলকাতার প্রায় কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পেয়ারাগাছি গ্রামে থাকি। মঙ্গলগ্রহে কোনদিন যাইনি; সেখানে গেলে আমার অমঙ্গল হতে পারে।' পরে বললেন—

ব্রহ্মনারায়ণ খাঁ নাম,
থাকি পেয়ারাগাছি গ্রাম।
ছেলেবুড়ো আদর করে,
খাঁ-দাদু বলে ডাকে মোরে।
এই পোশাক ভালবাসি,
এটাই পরে ঘুরে আসি।

মাথা আমার সুস্থ আছে,
সবায় আমি টানি কাছে।
খাঁচাটা আঁটা আছে কাঁধে,
পরনে ধুতি সাদাসিধে।

লোকটি তাঁকে নমস্কার করে আবার ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াল। খাঁ-দাত্থ কিছু দূরে গিয়ে দেখলেন একজন একটা ক্যামেরা হাতে নিয়ে তাঁর দিকে আসছে। সে কাছে এসে বলল, 'দেখুন, ওখানে আমাদের বাড়ির ধারে একটু আসবেন? আপনার একটা ফটো তুলতে চাই।' খাঁ-দাত্থ বললেন, 'আরে ছোঃ! আমি আবার একটা মানুষ! আমাব আবার ফটো! এই তো চেহারা আর এই তো পোশাক।' লোকটি বলল, 'ও কথা শুনব কেন? অনেকেই বলেছেন যে আপনি একজন মহাত্মা-টহাত্মা হবেন, অন্তত আপনার মতন এমন চমৎকার এক দাত্থ এই পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যাবে না।'

দাত্থ তখন তাকে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন, 'আমি কলেজ স্ট্রিটে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে পোশাক বদলিয়ে টুপিটা খুলে ভদ্দর-সদ্দর হই, তখন ফটো তোলা যাবে।' ক্যামেরাওয়ালা বলল, 'দেখুন, সকলের ইচ্ছা যে এখানেই ছবি তোলা হোক; এই পোশাকেই আপনার দাত্থ-দাত্থ ভাব বেশ খোলে।'

খাঁ-দাত্থ তখন রাজী হলেন। তাঁকে একধারে নিয়ে গিয়ে ফটো তোলা হল। ত্থ-তিন দিনের মধ্যেই ফটো পাবেন বলে আশ্বাস পেলেন, পথে যেতে যেতে কত লোকের সঙ্গেই তাঁর কত-না আলাপ হল। সকলেই জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার সঙ্গে আবার কোথায় দেখা হবে?' তিনি সকলকেই বলেন, 'আমি এখন কিছুদিন বিকালে-সন্ধ্যায় কলেজ স্কোয়ারে বসব, সেখানেই গল্পসল্প হবে।'

তিনি কলেজ স্ট্রিটে তাঁর বন্ধুর বাড়িতে ঢুকতেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 'ইঞ্জিন দাত্থ এসেছেন' বলে চেঁচিয়ে উঠল। বড়রা তাদের বললেন, 'ইঞ্জিন-দাত্থ নয়, খাঁ-দাত্থ।' খাঁ-দাত্থ নিজে কিন্তু বললেন, 'আহা, ওরা ছেলেমানুষ, ওরা যে নামেই আমাকে ডাকুক আমার মিষ্টি লাগবে।' বাড়িময় একটা আনন্দের উৎসব লেগে গেল।

খাঁ-দাত্থ খাঁচাটা ছেড়ে রাখলেন, টুপিও খুললেন। পরনে সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবি ছিল। একটা ব্যাগের মধ্যে পরিষ্কার ধুতি আর গেরুয়া রঙের চাদর এনেছিলেন, স্নান করে সেগুলো গায়ে দেবেন।

খাঁ-দাছু বললেন, 'পেয়ারাগাছি গ্রামে আমার চেনা একটি লোক পাখির খাঁচা বানাতে বড়ই ওস্তাদ ; সে শক্ত শক্ত কাঠি দিয়ে এই খাঁচাটা বানিয়েছে আর ছাতার কালো কাপড় দিয়ে খাঁচাটা মুড়ে দিয়েছে।'

তিনি স্নান করে খেয়ে দেয়ে সকলের সঙ্গে একটু গল্প করলেন। পরে বিশ্রাম নিলেন। বিকালে জলযোগ সেরে বললেন, 'এখন একটু বেড়িয়ে আসি।'

ধুতি গেঞ্জি পাঞ্জাবির উপরে তাঁর সেই সুন্দর পোশাকটা বা এঞ্জিনের মতন খাঁচাটা পরে নিয়ে তিনি কলেজ স্কোয়ারের দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁর বন্ধুর বাড়ির কেউ কেউ সঙ্গে চলল আর পথে একদল লোক তাঁর সঙ্গে জুটে গেল। কলেজ স্কোয়ারে ঢুকতেই তাঁর চেনা একটি বুড়ো মানুষ 'আসুন, আসুন' বলে তাঁকে ডেকে নিয়ে একধারে বসালেন আর ছু-চার কথায় সকলের কাছে খাঁ-দাছুর পরিচয়টা দিলেন। খাঁচাটা একটু সামলিয়ে রেখে দিয়ে দাছু একটু কায়দা করে বসলেন।

সকলেই তাঁর হাসিমুখেব দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সেই বুড়ো মানুষটি তাঁকে বললেন, 'আপনার গ্রামের খবর-টবর একটু বলুন ; ছেলেবুড়ো সকলেই একটু গল্প শুনতে চায়।'

খাঁ-দাছু বললেন, 'আবে, সেদিন আমাদের গ্রামে যা ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেল তা স্বপ্নের চেয়েও অদ্ভুত। গভীর রাত্রে গ্রামের একটা গাছের উপর এক ব্রহ্মদৈত্যকে বিচ্ছু কামড়েছিল। রাগে আর জ্বালায় ব্রহ্মদৈত্যের সে কী চিৎকার, কী হুঙ্কার, কী দাপাদাপি! গাছটা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। বিচ্ছুটা ভয়ে ছুর্গা ছুর্গা বলতে বলতে কোথায় জানি পালিয়ে গেল।'

খাঁ-দাছু একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, 'গাছের চারদিকে লোক জমা হয়ে গেল, কিন্তু সকলেই একটু দূরে দূরে রইল ; বেশি কাছে যেতে কেউ সাহস পেল না। ব্রহ্মদৈত্য অদ্ভুত গলায় বলল, 'বিষের জ্বালায় শেষে বাঁদর-বোবা হয়ে যেতে হবে, আপনারা এই বেলা ডাক্তার কবিরাজ ডাকুন। ঐ বদমায়েশ বিচ্ছুটা পালিয়ে গেল, তা না হলে ওটাকে শকুনি দিয়ে খাওয়াতাম।' এই বলে ব্রহ্মদৈত্যটা একটু নিস্তেজ হয়ে পড়ল।'

গল্প শুনতে শুনতে একটি ছেলে জিজ্ঞেস করল, 'দাছু যে-লোকটি আপনার এই সুন্দর পোশাকটা বানিয়ে দিয়েছে, সে তখন কোথায় ছিল?'

খাঁ-দাছু বললেন, 'সে সেখানেই ছিল। তার নাম নটবর। সে সেই মুহূর্তে ডাক্তার ডাকতে গেল। গিয়ে দেখে, ডাক্তার অন্য এক গ্রামে রোগী

দেখতে গিয়েছিলেন। তখন সে কবিরাজের কাছে গেল, কিন্তু সেখানে ব্যাপার দেখে তার চক্ষুস্থির। কবিরাজ মশাইকেও বিচ্ছু কামড়িয়েছে। তবু তাঁকে ব্রহ্মদৈত্যের কথা বলা হল। কবিরাজ মশাই বললেন, 'আরে বাপু, বিচ্ছুর কামড়ে ব্রহ্মদৈত্য তো আর মারা যাবেন না, তিনি কতকটা দেবতা ধরনের লোক। আমার কিন্তু বিষের জ্বালায় আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাচ্ছে। যেটুকু ওষুধ আছে তাই দিয়ে আগে নিজেকে বাঁচাই।' নটবর তখন ওঝার কাছে গেল। ওঝা বেজায় রেগে গিয়ে বলল, 'এত রাত্রে তোমরা আমাকে ব্রহ্মদৈত্যের কাছে পাঠিয়ে রগড় দেখতে চাও? তোমাদের শখ তো কম নয়। আমি সাপের কামড়ের ওষুধ জানি, কিন্তু বিচ্ছুর ওষুধ আমার কাছে কবে দেখলে হে?' নটবর তখন ফিরে এসে ব্রহ্মদৈত্যকে সব কথা খুলে বলল। তখন কী হল শোন—

ব্রহ্মদৈত্য তাই শুনে বলল, 'তবে সেই দাড়িয়াল মুশকিল-আসানের কাছে যাও। লোকটা সকলকে আরাম দিয়ে বেড়ায়; ভাল লোক।' নটবর তখন মুশকিল-আসানের কাছে গিয়ে সব কথা বলতেই মুশকিল-আসান চমকিয়ে উঠে বলল, 'অ্যাঁ। দাদা সায়েবকে বিচ্ছু কামড়িয়েছে! শুনলেই আক্কেল বুদ্ধি গোম হয়ে যায়। সায়েব বড় কষ্ট পাচ্ছেন, তাঁকে তো আরাম দিতেই হবে। এখুনি যাচ্ছি।' এই বলে সে হুঁকো-কলকে আর তামাক নিয়ে নটবরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতে সে বলছে 'তাজ্জব কাণ্ড! ঠাকুর সায়েবকে বিচ্ছু কামড়িয়েছে! তাজ্জব কাণ্ড!' আধ ঘণ্টার মধ্যেই তারা সেই গাছটার কাছে এসে পড়ল।'

যারা গল্প শুনছিল তাদের মধ্যে একজন বলল, 'দাদু, আপনি তখন কোথায় ছিলেন?' খাঁ-দাদু বললেন, 'আমি সেদিন দূরে এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে লোকদের কাছে যেমনটি শুনেছি তেমনই বলছি। আপনারা শুনুন। মুশকিল-আসানকে দেখে কেউ কেউ বলল, 'ও পারবে কেন? ভালমানুষ বটে, কিন্তু ওর শক্তি সাধ্যি জারিজুরি কতটুকু?' আবার কেউ কেউ বলল, 'ভাল মানুষ বলেই ও অন্যের ভালও করতে পারে; আমরা তো দেখেছি।' ব্রহ্মদৈত্য তখন একটু চাপা গলায় গোঁ গোঁ শব্দ করছে। মুশকিল আসান এসেই তামাক ধরাতে বসে গেল। তখন এক মজা হল।

ব্রহ্মদৈত্য মুশকিল-আসানকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ভায়া এসেছ? আমি এখান থেকেই তোমার দাড়ির গন্ধ পাচ্ছি।' মুশকিল-আসান উত্তর দিলেন, 'না ঠাকুর সায়েব, ওটা আমার দাড়ির গন্ধ না, ওটা তামাকের গন্ধ। আপনাকে ভাল

করার জন্য তামাক এনেছি ; এতে পীর সায়েবের একটা ওষুধের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছি।' ব্রহ্মদৈত্য বলল, 'তামাকের গন্ধ তো পাচ্ছিই, তাছাড়া তোমার দাড়ির গন্ধও এই ব্রহ্মদেবতার নাকে এসে ঢুকেছে।' মুশকিল-আসান বলল, 'বর্ধমানের পীর সায়েব সেদিন এসে আমাকে একটু আতর দিয়ে গেছেন ; দাড়িতে সেটা একটু মেখেছি।' হুঁকো-কলকেতে তামাক ধরিয়ে গাছতলায় সেটা রেখে মুশকিল-আসান বলল, 'ঠাকুর সায়েব, এই তামাকটা খান। একটু ঠাসা তামাকও রেখে যাচ্ছি ; সেটাকে কামড়ের জায়গায় ঘষবেন।' ব্রহ্মদৈত্য নেমে আসতেই হুদ্-বদিয়ে অনেকে পিছনে সরে গেল। সকলে তার চেহারা দেখবার চেষ্টা করছে।

ব্রহ্মদৈত্যকে একটি লম্বা কালো মানুষের মতন দেখাচ্ছিল, তবে অন্ধকারে চেহারা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। তামাক খেতে খেতে সে নানারকম আরামের শব্দ করছিল। শেষে সে হুঁকো-কলকে রেখে ঠাসা তামাকের সেই ডেলাটা তুলে নিয়ে পায়ে সেই কামড়ের জায়গায় ঘষে নিল। পরে সুড় সুড় করে গাছে উঠে গেল। সকলের কান খাড়া—

গাছে উঠে ব্রহ্মদৈত্য চুপ করে রইল, কেউ তার সাড়া শব্দ পাচ্ছে না। কেউ কেউ বলল, 'ব্রহ্মদৈত্যের অবস্থা বোধ হয় কাহিল।' তাই শুনে সে গম্ভীর গলায় বলল—

'দিলেও কামড় বিচ্ছু দুরাচার,
হবে না মরণ ব্রহ্মদেবতার।
জ্বালায় শুধুই ছিলাম কাতর,
হঠাৎ দাড়িতে লাগিয়ে আতর
মুশকিল আসান হেথা ছুটে এল,
বিষের জ্বলুনি কোথা চলে গেল।
ওকে কিনে দিও দাড়ির আতর,
মেখে মেখে ওর জুড়োবে গতর।
চাঁদা তুলে সবে ওকে কিছু দিও,
নেমন্তন্ন পেলে ওকে ডেকে নিও।'

তাই শুনে সকলে বলল, 'দাদাঠাকুর, আমরা খুশী হয়েই ওকে কিছু দেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি ; আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।' ব্রহ্মদৈত্য বলল, 'আমি রাত তিনটেয় গাছ থেকে নেমে দূরদেশে চলে যাব।' লোকেরা তখন নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল, 'তিনটে বাজতে কিন্তু বেশি দেরি নেই ; আমরা এই বেলা সরে

পড়ি।' ওরা ব্রহ্মদৈত্যকে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। মুশকিল-আসানও অনেক সেলাম আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বাড়ি গেল। পরদিন সকালে দেখা গেল, সেই গাছতলায় শুধু হুঁকো-কলকে পড়ে আছে।'

গল্প শেষ করে খাঁ-দাদু বললে, 'আজ তবে উঠি, কলেজ স্ট্রিটে ফিরে যাই। কাল বিকেলে আবার এখানে বসা যাবে।' দাদু খাঁচাটা আবার গায়ে এঁটে দিলেন। টুপিও পড়লেন।

বন্ধুর বাড়ির লোকদের সঙ্গে গল্প করতে করতে খাঁ-দাদু ফিরে এলেন। বন্ধু অনিলবাবু সেই রাত্রে বাড়িতে একটু বিশেষরকমের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছিলেন। খাঁ-দাদু সাদা ধুতি পাঞ্জাবীর উপরে তাঁর গেরুয়া রঙের চাদরটা কাঁধে ফেলে নিয়ে খেতে বসলেন। খেতে খেতে বললেন, 'আজ বড় ভাল খাচ্ছি, তবে অনেক বছর আগে এই বাড়িতেই সেই যে ময়ূরের ডিমের মামলেট আর কাঁঠালের রসের আইসক্রীম খেয়েছিলাম তার তুলনা নেই। রাজা-রাজড়ার বাড়িতেও ঐ দুটি খাদ্য পাওয়া যায় না।'

তাঁর বন্ধু অনিলবাবু বললেন, 'বেশি তো খেলে না?' খাঁ দাদু বললেন, 'যা খেয়েছি তা একজন খাইয়ের পক্ষেও যথেষ্ট, আর আমি পেটুক হলেও বুড়ো হয়ে আসছি। এখন আসল খবরটা শুনে রাখো—

একদিন এই দেহে করিয়ে ভোজন,
দশগুণ বেড়ে গেল ভুঁড়ির ওজন।
বড়ই দয়ালু তুমি, পেটুকের গতি,
আমাকে খাওয়াতে যেন থাকে তব মতি।
এর বেশি খাদ্যরাশি করিলে আহার,
পেটে গিয়ে তারা সবে করিবে প্রহার।'

সকলে তখন বললে, 'তা আপনি যতটা পারেন খাবেন, কম কম খাবেন না।'

খেয়ে উঠে বিশ্রাম নিতে নিতে খাঁ-দাদু বললেন, 'একজন খুব নিন্দুক লোক ছিল। তাকে নেমন্তন্ন খাইয়ে খুশী করা যেত না। খাওয়া যতই ভাল হোক, সে একটা না একটা দোষ ধরত। একবার এক ডাক্তার তাকে খুব ভাল করে নেমন্তন্ন খাওয়াল। সেই নিন্দুক খুব আরাম করে খাচ্ছে দেখে সকলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন খাচ্ছেন?' নিন্দুক লোকটি উত্তর দিল, 'খাওয়াটা তো খুব ভালই হতে পারত, তবে আপনাদের বাড়ির জলটা একটু বেশি পাতলা, নুনটা একটু বেশি

নোনতা, আর থালাটা একটু বেশি গোল।' তখন সেই ডাক্তার তাকে বলল, 'আপনার তবে খেতে একটু অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ভাল ভাল খাবার পেয়ে আপনার জিভ দিয়ে এত জল ঝরছে যে আমাদের বাড়ির জলটা আপনার পাতলা লাগছে, খাওয়ার আনন্দে আপনার চোখের নোনতা জল গড়িয়ে গড়িয়ে আপনার মুখে ঢুকছে বলে নুনটা আপনার বেশি নোনতা লাগছে, আর আপনার চোখের তারা বড় বেশি গোল তাই থালাটাকে বেশি গোল দেখছেন।' তাই শুনে সেই নিন্দুক লোকটা 'তত বেশি অসুবিধে হচ্ছে না।' বলে আবার হাপুস হুপুস করে খেতে লাগল।'

পরের দিন সকালে খাঁ-দাদুর ফটো নিয়ে সেই ক্যামেরাওয়ালা এসে দাদুর বন্ধুর বাড়িতে তিনটে ফটো দিল আর বলল, 'এই ছবি অনেকে কিনছে, আমার বেশ লাভ হচ্ছে।' ফটোওয়ালাকে জলখাবার খাইয়ে দেওয়া হল। একটা খাঁ-দাদু রাখলেন, একটা তাঁর বন্ধু অনিলবাবু রাখলেন, আর বাকিটা তাঁদের এক চেনা লোক নিয়ে গেলেন।

বিকেলে খাঁ-দাদু বেড়াতে বেড়াতে আবার কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে বসলেন। এবারে সকলে বলল, 'আপনাদের গ্রামেরই আর একটা খবর বলুন ; ঐ খবর-গুলো শুনতে খুব ভাল লাগে।'

খাঁ-দাদু বললেন, 'হ্যাঁ, আর-একটা অদ্ভুত খবর আছে বটে। বাঘা ভুতুমের বাড়ি আমাদের গ্রামের এক কিনারায়, আমার বাড়ি থেকে অনেক দূর। তাঁর আসল নাম ছিল উগ্রমোহন সিংহ, কিন্তু লোকে তাঁর নাম রেখেছিল বাঘা-ভুতুম। বদরাগী হাঁড়িমুখো মানুষ ; রেগে গেলে মুখটা সারাদিন হুতোম প্যাঁচার মতন হয়ে থাকত। তাই নাম হল ভুতুম। পরে তিনি দুবার খুব বিরক্ত হওয়াতে তাঁর মুখটা মাসের পর মাস হুতোম প্যাঁচার মতই হয়েই রইল ; তখন নাম হল বাঘা ভুতুম।'

খাঁ-দাদু একটু গম্ভীর হয়ে, গাল ফুলিয়ে বাঘা ভুতুমের চেহারাটা সকলকে একটু বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন।

পরে আবার বলতে লাগলেন, 'উগ্রমোহন বুড়ো গোছের মানুষ, মাথায় টাক। একদিন তিনি গাছতলায় গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে দাঁতন করছেন ; হঠাৎ তাঁর টাক ভয়ানক কুটকুট করতে আর চুলকোতে লাগল। তিনি মাথা ঝাড়া দিতেই একটা শুঁয়োপোকা মাটিতে পড়ল। তিনি সেটাকে একটা পাতায় তুলে নিয়ে রেগে কটমট করে দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ দেখেই তিনি সেটাকে 'গদাগুণ্ড' বলে

একটা বিচ্ছিরি ধমক দিলেন, শুঁয়োপোকাটাও মরে গেল। এর পর তাঁর মুখ গোমড়া ফুলে বেঁকে প্রায় তিনদিন পর্যন্ত প্যাঁচার রাজার মতন হয়েই রইল।'

একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা খাঁ-দাদু, ভুতুম তো শুঁয়োপোকাটাকে মারবার চেষ্টা করেননি, তবু সেটা মরে গেল কেন?'

খাঁ-দাদু বললেন, 'ঠিক সেইদিন আমাদের গ্রামের এক ডাক্তারের ছেলে শুঁয়োপোকাটাকে ভুতুমের পাল্লায় পড়তে দেখেছিল। সে লোকদের বলেছিল যে, ভুতুমের বিচ্ছিরি চেহারা আর ধমক খেয়ে শুঁয়োপোকাটার হার্টফেল করেছিল, তাই সেটা মরে যায়। ডাক্তারের ছেলেব কথা কেউ কেউ খুব বিশ্বাস করেছিল।'

সেই ছেলেটি আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা দাদু! ভুতুম নামটা পরে কেন বাঘা ভুতুম হল?'

খাঁ-দাদু বললেন, 'এর পরে ভুতুম একদিন গাঁয়ে পথ ধরে যাচ্ছিলেন; পেছনে পেছনে এক ধোপার গাধা পিঠে প্রকাণ্ড এক বোঝা নিয়ে আসছিল। ধোপা একটু তাড়া দেওয়াতে গাধা ছুটতে ছুটতে হুড়মুড় করে ভুতুমের উপরেই এসে পড়ল। ভুতুম তো পা পিছলে আলুব দম! গাধার পিঠের বস্তাটা গড়িয়ে পড়ে ভুতুমকেই চাপা দিল। রাগে ভুতুমের গায়ে অসুরের মতন জোর এসে গেল। তিনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন আর কাপড়ের বস্তাটাকে লাথি মারতে মারতে ধোপার দিকেই গড়িয়ে নিয়ে চললেন। ধোপা ভয়ে লাফ দিয়ে গাধার পিঠেই চড়ে বসল, আর গাধাটাও ভুতুমের ভয়ে ছুটে বিড়-বিড়-বিড় করে পালিয়ে গেল। রাগে ভুতুমের পাঁচ মাস যা চেহারা হয়ে রইল তার বর্ণনা দেওয়া যায় না! শোনা যায়, একদিন রাত্রে ভুতুমের চেহারা দেখে প্যাঁচারা ঘেন্নায় লজ্জায় 'ছিঃ' বলে জিভ কেটেছিল। তখন থেকে তাঁর নাম হয়ে গেল বাঘা-ভুতুম।'

একজন জিজ্ঞাসা করল, 'খাঁ-দাদু, ভুতুমের চেহারা আবার আগের অবস্থায় ফিরে এল কি করে?'

খাঁ-দাদু বললেন, 'তিনি যখন বাঘা ভুতুম হয়েই রয়েছিলেন তখন আমার এঞ্জিনের মতন পোশাকটা তয়েরি হয়েছিল। একদিন এই পোশাকটা পরে বেড়াতে বেড়াতে বাঘা ভুতুমের মুখে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল। আর একটা অস্পষ্ট হাসির শব্দও বেরিয়ে গেল। তারপরে অনেক ঘটনা ঘটেছিল। সে-সব কথা কাল বিকেলে আবার এখানে এসে সকলকে বলা যাবে।'

খাঁচাটা গায়ে এঁটে নিয়ে দাদু উঠলেন। তাঁর বন্ধুর বাড়িতে সেই রাত্রেও

একটু ভোজের ব্যবস্থা হয়েছিল। দাতু খেতে বসলে পরে একটি ছেলে বলল, 'দাতু, আমি একটা ছোট কবিতা বানিয়েছি, শুনবেন?' দাতু রাজী হলেন। ছেলেটি তার কবিতা শোনাল—

'খেয়ে খেয়ে নানা ভাল খাবার,
দাঁত পড়ে গেল সাধুবাবার।'

ছেলেটির ভাই বলল, 'ইঞ্জিন দাতু, আমিও কবিতা বানাতে শিখছি। এই শোনাচ্ছি—

জুতোর খোঁজে সে বাগানে চলিল,
শুধুই জুতোব ফিতেটা মিলিল।'

দাতু বললেন, 'আরে! আমাদের গাঁয়ে একজন লোকের ঐরকম হয়েছিল।'

প্রথম ছেলেটি আবার বলল, 'দাতু, আর একটা কবিতা শোনাচ্ছি—

খেটে খেটে মল রিকশাওয়ালা,
মজুরীটা পেল কাবুলীওয়ালা।'

ছেলেটি বলতে লাগল, 'এক রিকশাওয়ালা এক কাবুলীব কাছে টাকা ধাব করেছিল বলে সেই কাবুলীওয়ালা তার কাছে টাকা নিতে আসত। তাই দেখে কবিতাটি লিখেছিলাম।'

দাতু বললেন, 'তুমি কবিতা লেখার অভ্যাস ছেড়ে দিও না।'

ছেলেটির সেই ভাই তখন বলল, 'ইঞ্জিন-দাতু, আমিও আব একটা কবিতা শোনাচ্ছি—

বেশি বেশি লিখে তার ক্ষয়ে গেল পেনসিল,
বেশি কথা বলে বলে বেড়ে গেল টনসিল।'

দাতু বললেন, 'বাঃ, তুমিও ভাল কবিতা লেখা অভ্যাস করবে।'

প্রথম ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'দাতু, আপনাদের গাঁয়ের সেই মুশকিল-আসান আপনার সম্বন্ধে কবিতা বানায় নি?' দাতু বললেন, 'সে তো কবিতা বানায় না।' ছেলেটি বলল, 'আপনার নামেও বানায় না?' দাতু বললেন, 'না সে মোটেই কবিতা বানায় না।' ছেলেটি তখন বলল, 'আচ্ছা, আমি সেই মুশকিল-আসানের হয়ে আপনার নামে কবিতা বানাচ্ছি—

বদর! বদর! দাতুর কদর
বাড়ছে কেবল, পাচ্ছে আদর।'

দাতু বললেন, 'তুমি বদর কথাটা কোথায় শিখেছ?'

ছেলেটি বলল, 'মুসলমান মাঝিদের কাছে ঐ কথা শুনেছি ; তাদের একজন পীরের নাম বদর, তাও শুনেছি।'

দাতু বললেন, 'গাঁয়ে ফিরে গিয়ে তোমার কবিতাটি মুশকিল-আসানকে শুনিয়ে দিতে আমার খুব ইচ্ছা রইল।'

খেয়ে উঠে বিশ্রাম নিয়ে দাতু ঘুমোতে গেলেন। দাতুর কথায় পরের দিনের দুপুরের খাওয়াটা একটু সহজ ধরনের করা হল।

বিকেলে দাতু আবার কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে বসলেন। বাঘা ভুতুমের কথাটা আগর দিন দাতু শেষ করতে পারেন নি, তাই সকলে সেই কথাই শুনতে চাইল। দাতু বললেন, 'কাল বলেছিলাম যে, বাঘা ভুতুম প্রথম যেদিন আমার পোশাকটা দেখেছিলেন সেইদিনই তাঁর মুখে প্রথম হাসির রেখা দেখা গিয়েছিল। একটা অস্পষ্ট হাসির শব্দও তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু সেদিন তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেন নি। পরের দিন সকালে কি ভেবে আমি আবার তাঁর বাড়ির সামনে গেলাম। তিনি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন আর অবাক হয়ে আমাকে দেখতে লাগলেন। তার পরেই বললেন, 'মশায়, এই পোশাকে কোথায় চলেছেন? এর মানে কী? একটু দাঁড়াবেন? না হয় আমার ঘরেই এসে একটু বসুন-না কেন?' বাঘা ভুতুম হঠাৎ এইভাবে ডাকায় আমার মনটা একটু গলে গেল ; আমি তাঁর ঘরে গিয়ে বসলাম।'

একজন জিজ্ঞাসা করল, 'দাতু আপনার ভয় করছিল না?' দাতু বললেন, 'ভয় করবে কেন? তিনি তো রাক্ষস নন! তাছাড়া এই পোশাকটা গায়ে দিলে আমার ভয়-টয় থাকে না। আমি বসতেই বাঘা ভুতুম বললেন, 'মশায়, আপনাকে প্রথম দিন এই পোশাকে দেখার পর থেকে খালি আপনার কথা মনে হচ্ছে। এমন তো আমার সচরাচর হয় না! এই পোশাকের মধ্যে কিছু একটা জাতু আছে।' আমি বললাম যে আমার গুরুদেব আমাকে ঐরকম পোশাক বানিয়ে পড়তে বলেছিলেন ; এটা বেড়াবার পোশাক। গুরুদেব আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি এই পোশাক ব্যবহার করলে অনেকের মন জয় করতে পারবে, অনেকের অনেক ভাল করতে পারবে, অনেকের অনেক ভাল করতে পার।' তাই এই পোশাক পরছি।'

একজন বলে উঠল, 'আপনার গুরুদেবের কথা ফলেছে। এই পোশাক পরে বাঘা ভুতুমের উপকার করেছেন, এখানকার ক্যামেরাওয়ালার উপকার করেছেন, আপনার বন্ধুর বাড়ির সকলের উপকার করেছেন, আর আমাদেরও আনন্দ দিচ্ছেন।'

দাছু বললেন, 'বাঘা ভুতুমও আমাকে বলেছিলেন, 'আপনার গুরু খুব পাকা গুরু। আপনাকে একদিন নেমন্তন্ন খাওয়াতে ইচ্ছা করছে। আমার নিজের খাওয়াদাওয়া অদ্ভুত রকমের। আপনি সেসব জিনিস খেয়ে আনন্দ পাবেন না! তাই আপনাকে আপনার পছন্দের নানা জিনিস খাওয়াতে চাই।' কিছুক্ষণ কথা বলে বুঝলাম যে আমার পছন্দের জিনিসগুলো বাঘা ভুতুমের পছন্দ হবে না। তখন হঠাৎ বলে ফেললাম বাঘা ভুতুমের যা যা জিনিস পছন্দ আমিও তাই তাই খাব। তখন তাঁর আনন্দ দেখে কে? পরের দিন চার বেলাই আমার নেমন্তন্ন রইল—সকালে, দুপুরে, বিকালে, রাত্রে।'

শুনতে শুনতে একজন বলল, 'মানুষ যা খায়, বাঘা ভুতুমও তো তাই খান?' দাছু বললেন, 'হ্যাঁ, মানুষে সে-সব খেয়ে থাকে, তবু সে খাওয়া বড়ই অদ্ভুত! পরের দিন সকালে বাঘা ভুতুমের কাছে যেতেই তিনি খুব যত্ন করে খাওয়াতে বসালেন, নিজেও বসলেন। এমন অদ্ভুত খাওয়া আজ পর্যন্ত কেউ খায়নি। খাবারের তালিকা দিচ্ছি—

সকালে—আইসক্রীম, আমসি, আলুসিদ্ধ, আখরোট, আমড়ার অম্বল, আপেলের রস।

দুপুরে—ছাতু, ছাঁচি পান, ছানার জল, ছোলাভাজা, খৈ, খরমুজা, খলসে মাছের ডিমডাম, খেজুরের চাটনি, খেঁসারির ডালের বড়ি, গাওয়া ঘি, গুঁজিয়া, লজঞ্চুস, হিঞ্চে শাক (হেলেঞ্চা), হরতকী, হজমিগুলি। বিকালে—চা, চালকুমড়োর চপ, চিঁড়ে, চালতার চাটনি, চানাচুর, চুয়িংগাম, চকোলেট। রাত্রে—ডালের বড়া, ডুমুর সিদ্ধ, ডাবের শাঁস, ডিমের ঘুগনি, ডেঙো শাক, পেঁপের চাটনি, পিয়াল ফল, পেস্তা, বাতাসা, বেলের মোরব্বা, বাতাবি লেবু, জলপাই, জিলাপি, মিঠাপান।'

খাবারের নামগুলো শুনেই একজন জিজ্ঞাসা করল, 'এইসব খেয়ে আপনার বা বাঘা ভুতুমের অসুখ করেনি?'

দাছু বললেন, 'আমি সব জিনিস কম করে খেয়েছিলাম, তবু পরের দিন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। বাঘা ভুতুম তো ঐ সব জিনিস মধ্যে মধ্যে খাওয়া অভ্যেস করেছিলেন, আর ঐ ধরনের খাওয়া তাঁর ভালই লাগত। তাঁর সব হজম হয়েছিল। আমাকে নেমন্তন্ন খাইয়ে তাঁর মন অনেকখানি হালকা আর ঠাণ্ডা হয়ে এল। পরের দিন আমার খবর নেবার জন্য একটি লোককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি আমার অসুখের কথা এইভাবে লিখে দিলাম—

উদরে বড় অম্বলম্,
শরীরে বড় কম বলম্,
ভুঁড়িটি পচে দম্বলম্,
বুদ্ধি শুদ্ধি ভোম্বোলম্,
ছড়িয়ে দুখানা কম্বলম্,
করেছি বিছানা সম্বলম্ ।'

অনেকে একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'এই কবিতাটা পড়ে বাঘা ভুতুমের নিশ্চয় আরো উপকার হয়েছিল ।'

দাদু বললেন, 'এ হচ্ছে আমার গুরুদেবের বিদ্যার খেলা ; তিনি যদি আমাকে এই ইঞ্জিনের মতন পোশাকটা বানাতে না বলতেন তবে আমাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে বাঘা ভুতুমের ইচ্ছেই হত না । কবিতায় আমার অসুখের কথা পড়ে দুঃখিত হয়ে বাঘা ভুতুম ঐ সব অদ্ভুত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন । এখন তাঁর সাধারণ খাওয়া ভাল লাগে ।'

কেউ কেউ জানতে চাইল যে বাঘা ভুতুমের চেহারা এখন কেমন হয়েছে । দাদু বললেন, 'চেহারা প্রায় স্বাভাবিক । একটা খুব অস্পষ্ট হুতোম-হুতোম ভাব এখনও আছে বটে, কিন্তু আগেকার চেহারার সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাৎ । তাঁর গ্রামের বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে কাশীতে গিয়ে রয়েছেন ; সেখানেই থাকবেন ।'

খাঁ-দাদু সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বললেন, 'আমি কাল পেয়ারাগাছি গ্রামে ফিরে যাচ্ছি । যদি বেঁচে থাকি তবে কয়েক বছর পরে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে ।'

বন্ধু অনিলবাবুর বাড়িতেও তিনি ঐ কথাই বললেন । পরের দিন ব্রহ্মনারায়ণ খাঁ পেয়ারাগাছি গ্রামে ফিরে গেলেন । তিনি অনেকদিন বেঁচে থাকুন । পেয়ারাগাছি গ্রাম বিখ্যাত হোক ।

ঠেকে শেখো

একজন ভদ্রলোকের একটা বদঅভ্যাস ছিল, তিনি রোজ অফিসে যেতে দেরী করতেন। সকালে ঘুম ভাঙলে বিছানা থেকে সহজে উঠতে চাইতেন না। এক-ঘণ্টা কেবল এপাশ-ওপাশ করতেন, তারপর গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে কুড়ি মিনিট হাই তুলতেন। কোন কোন দিন এত দেরীতে উঠতেন যে, স্নান করবার সময় পেতেন না, কোনমতে চারটি ভাত মুখে গুঁজে অফিসে দৌড়তেন। তার জন্য ভদ্রলোকের শরীরও খারাপ হচ্ছিল, অফিসের কাজেরও ক্ষতি হচ্ছিল, কিন্তু তিনি তবু ঘুম থেকে উঠতে দেরী করতেন।
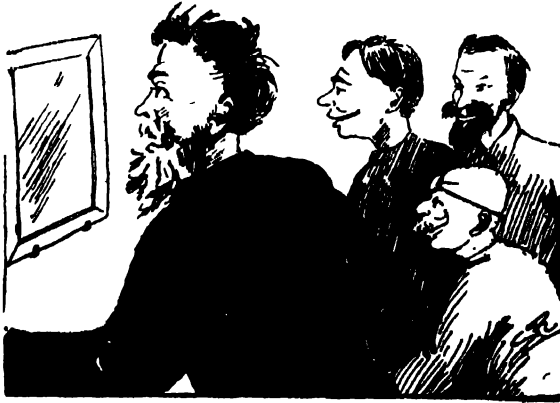
একদিন তিনি উঠে দেখেন যে, ভাত খাবার আর সময় নাই, অফিসে যাবার বেলা হয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পথের একটা দোকান থেকে কয়েকটা কচুরি আর একটা রসগোল্লা কিনে নিয়ে তাই খেতে খেতে অফিসের দিকে ছুট দিলেন। একটু দূর যেতেই একটা চিল ছোঁ মেরে কচুরির ঠোঙাটা নিয়ে গেল, তিনি একরকম না খেয়েই অফিসে গেলেন। অফিসে গিয়েই তাঁর মনে হল— ঐ যাঃ, তিনি কচুরিওয়ালাকে একটা টাকা দিয়েছিলেন, খাবারের দাম তো হয়েছিল মোটে ছয় পয়সা, কিন্তু অফিসের তাড়ায় বাকি পয়সা তো ফেরত নেওয়া হয়নি। সুতরাং ভদ্রলোকের সেদিন খাওয়াও হল না অথচ টাকাও গেল—অচেনা

ঠেকে শেখো

দোকানদার কিছুতেই স্বীকার করল না। তিনি সেদিন ঠিক করলেন যে আর ঘুম থেকে উঠতে দেরী করবেন না।

কিন্তু পরদিনও ভদ্রলোক উঠতে এত দেরী করলেন যে ভাত খাবার আর সময় পেলেন না, তাড়াতাড়ি শুধু একটু দৈ খেয়ে অফিসে ছুটলেন। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে রাস্তার মোড়ে হঠাৎ একটা ষাঁড়ের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে তিনি রাস্তায় পড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি উঠে আবার ছুটতে লাগলেন। খানিকটা দূরে গিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ী দেখতে পেলেন। তিনি ভাবলেন যে গাড়ীতে গেলে অল্প সময়ের মধ্যে অফিসে পৌঁছতে পারবেন, তাই ছুটে গাড়ী ধরতে গেলেন। কিন্তু গাড়ী ধরবার আগেই একটা আমের খোসায় পা পড়াতে পা পিছলিয়ে গেল। নিজেকে সামলাবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি পাশের একজন কাবুলিওয়ালার জামা খামচিয়ে ধরলেন। হঠাৎ জামায় টান পড়াতে কাবুলিওয়ালা একপাশে কাৎ হয়ে পড়ল আর নিজেকে বাঁচাবার জন্য পাশের এক পুলিশের পাগড়ী খামচিয়ে ধরল! পুলিশের মাথা থেকে পাগড়ী তখনি খুলে এল, তাই কাবুলিওয়ালা সেই ভদ্রলোকের উপর পড়ে গেল। ভদ্রলোকটি কাদাটাদা মেখে অনেক কষ্টে উঠে, কাবুলী আর পুলিশকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে একটা গাড়ী ধরলেন। ততক্ষণে অফিসে যাবার সময় অনেকক্ষণ হল পার হয়ে গিয়েছে!

গাড়ী অফিসের কাছে এসে থামবামাত্র তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নামতে গিয়েছেন। আর অমনি গাড়ীর দরজার এক পেরেকে জামার পকেট আটকিয়ে গিয়ে প্রায় আধ হাত জামা ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে গেল। তারপর গাড়োয়ানকে পয়সা দিতে গিয়ে দেখেন যে তাড়াতাড়িতে পয়সার ব্যাগ বাড়িতে ফেলে এসেছেন।

তারপর অফিসে যেই ঢুকেছেন, অমনি অফিসের লোকেরা তাঁকে দেখেই, 'একি মশাই! একি, একি করেছেন!' বলে চীৎকার করে উঠেছে!

তিনি ব্যাপার বুঝতে না পেরে আয়নার সামনে গিয়ে দেখেন যে, বাড়ি থেকে দৈ খেয়ে আসবার সময় তাড়াতাড়িতে ভাল করে মুখ মুছতে পারেন নি, তাই সমস্ত দাড়িতে আর গোঁফে দৈ লেগে রয়েছে!

নিজের দৈ মাখা চেহারা দেখে ভদ্রলোক সেদিনই প্রতিজ্ঞা করলেন আর কখনও ঘুম থেকে উঠতে দেরী করবেন না।

তখন থেকে তিনি প্রতিদিন সকালে উঠতেন আর অফিসে যেতেও দেরী হত না।

সদানন্দ স্বদেশলাল

১২ বছরের ছেলে স্বদেশলাল সেন তার গ্রামের স্কুল ছেড়ে কলকাতার এক স্কুলে এসে ভর্তি হল। কয়েকদিনের মধ্যে বোঝা গেল যে তার বেশ বুদ্ধি আছে আর স্বভাবও বেশ সরল, তবে চাল-চলন একটু অদ্ভুত ধরনের। সে স্কুলে নতুন নতুন রকমের টিফিন সঙ্গে নিয়ে আসত। পুদিনার আচার দিয়ে সিঙারা খেতে ভাল-বাসত। একদিন হয়ত চিড়েভাজা আর মানকচুর বড়া দিয়েই টিফিন হল, আবার মধ্যে মধ্যে টিফিনে চন্দ্রপুলি দিয়ে পাঁউরুটি খেত। কয়েকটি দিন পাঁপর ভাজা দিয়ে ছানার ডালনা বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেতে দেখা গিয়েছিল। যেদিন আমসত্ত্ব দিয়ে ধোকা খেত, সেদিন তার বেশ ফূর্তি দেখা যেত।

পড়াশোনায় সে ভালোই ছিল। গায়ে জোর, রঙ বেশ ফরসা, কপাল চওড়া, চোখে-মুখে একটা অস্পষ্ট হাসি-হাসি ভাব। খেলাধূলায়ও স্বদেশলালের উৎসাহ ছিল।

একদিন স্কুল ছুটি হয়ে গেলে ভয়ানক বৃষ্টি হতে লাগল। কেউ বাড়ি যেতে পারছে না। তখন একজন মাস্টারমশাই ছেলেদের বললেন, 'তোমরা কেউ একটা গল্প বলো; সকলে শুনুক।'

অন্য ছেলেরা যখন গল্প ভাবছে স্বদেশলাল তখন বলে উঠল, 'আমার মামা একবার সুন্দর স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই গল্প শোনাব?'

সকলেই শুনতে চাইল। স্বদেশ তখন বলে যেতে লাগল, 'আমার মামা একবার স্বপ্ন দেখলেন যে কলকাতায় একদল তেজী তেজী খেলোয়াড় এসেছে, তাদের সঙ্গে মোহনবাগান দলের ফুটবল ম্যাচ হবে। সেদিন ট্রাম বন্ধ ছিল, তাই বাসগুলোতে এত লোক হয়েছিল যে মামা কিছুতেই বাস ধরতে পারলেন না। ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ি, রিকসা, সব ভাড়া হয়ে গিয়েছিল! মামা মুশকিলে পড়লেন। মামার এক বন্ধু পালকি ভাড়া করে গড়ের মাঠে ম্যাচ দেখতে চললেন, কিন্তু মামার সেটা পছন্দ হল না।

'মামার বাড়ির একটু দূরেই গঙ্গা। তাঁর শখ হল তিনি নৌকায় উঠে গড়ের-মাঠের কাছাকাছি একটা ঘাটে নামবেন, আর সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে মাঠে খেলা দেখতে যাবেন।

'তিনি গঙ্গার ঘাটে গিয়ে এক ভয়ানক অদ্ভুত ব্যাপার দেখলেন, একটা বাচ্চা তিমি সেখানে সাঁতার কাটছে আর মধ্যে মধ্যে তীরে নাক ঠেকাচ্ছে। কোথা থেকে কেমন করে সেটা এল কেউ জানে না। ছোট্ট তিমিটির চেহারা বড়ই শান্ত আর আহ্লাদে, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। মামাকে দেখে সেটা এত খুশী হল যে মামা ছুটে গিয়ে সামনের একটা দোকান থেকে পাঁউরুটি কিনে আনলেন আর তিমির বাচ্চাটাকে রুটির টুকরো খাওয়াতে লাগলেন। তিনি মুখ উঠিয়ে সেটা খেতে লাগল।

'স্বপ্নের মধ্যে মামার একটা দারুণ বুদ্ধি এসে গেল। তিনি ঠিক করলেন যে ঐ তিমির পিঠে উঠে গঙ্গা বেয়ে গড়ের মাঠের কাছাকাছি একটা জায়গায় তীরে নেমে, হেঁটে খেলার মাঠে যাবেন। তিনি একটা বাঁশের ডগায় পাঁউরুটি বাঁধলেন আর জলের ধারে কিছু খাবার ছড়িয়ে দিলেন। তিমির বাচ্চাটা যখন তীরে মাথা উঠিয়ে সেই খাবার খাচ্ছে, মামা তখন বাঁশটা হাতে নিয়ে সাবধানে তিমির পিঠে উঠে বসলেন আর বাঁশের ডগার রুটিটা তিমির নাকের সামনে এগিয়ে রেখে বাঁশটাকে আস্তে আস্তে দক্ষিণ দিকে ফিরিয়ে ধরে রাখলেন, সেদিকে গেলে গড়ের মাঠের কাছাকাছি যাওয়া যাবে। তিমিটা সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ দিক ফিরে ফিরে রুটি ধরবার জন্য এগিয়ে যেতে লাগল, কিন্তু রুটিও সঙ্গে সঙ্গে তিমিটার সামনে সামনে ছুটে চলেছে। গড়ের মাঠের কাছে এসে মামা বাঁশের ওপরে রুটিটা আস্তে আস্তে তীরের দিকে ফেরালেন, আর তিমিও রুটির পিছনে ছুটে ছুটে তীরে পৌঁছে গেল। ডাঙায় তখন কী ভিড়, কী ভিড়, কী ভিড়! মামার সে দিকে খেয়াল নেই। তিনি তীরে নেমেই গড়ের মাঠের দিকে ছুটলেন।

'মাঠে গিয়েই তিনি একটা খাদের তলায় একটা উঁচু ঢিবির উপর দাঁড়ালেন। খেলা আরম্ভ হল। একদল লম্বা লম্বা তেজী তেজী মানুষ মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছে আর খেলতে খেলতে ঝটপটাপট বগল বাজিয়ে শূন্যে এয়া উঁচু-উঁচু লাফ দিচ্ছে। তা দেখে সকলের তো চক্ষু স্থির। পনেরো মিনিটের মধ্যেই সেই তালঢ্যাঙা লোকেরা মোহনবাগানকে তিনটা গোল খাওয়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু তিনবারই ফুটবলটা গোলপোস্টের অনেক উপর দিয়ে উড়ে গেল, আর অনেক দূরে গিয়ে পড়ল। সেই আখাম্বা লম্বা খেলোয়াড়দের লম্ফ ঝম্ফ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, তাদের সাত রঙা পোশাক রোদে ঝলমল করছে।

'এর মধ্যে এক অদ্ভুত কাণ্ড হল। নতুন দলের লোকগুলো যখন মহা তেজে হাই জাম্প দিতে দিতে এগিয়ে আসছে তখন মোহনবাগানের একটি বেঁটে লোক

ভল্লা দিয়ে পাঁই পাঁই করে এগিয়ে গিয়ে একটা গোল দিয়ে দিল। তখন চারদিকে ঘা হাততালি! "গোল" "গোল" বলে যা চিৎকার!

মামা হতভম্ব হয়ে সব দেখছেন। হঠাৎ তাঁর পাশের গাছ থেকে এক বুড়ো গোছের মানুষ তাঁর কাঁধের ওপর নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে মামা, 'আরে, আরে, আরে, আরে ধ্যাত্তেরি' বলে ঢিবির উপরে বসে পড়লেন। বুড়ো মানুষটি খুব বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে বলতে লাগল, 'বাবুমশাই, আমি কলকাতার একজন খুব নামজাদা বাঁদরওয়ালা, বাঁদর নাচিয়ে বেড়াই। খেলা দেখতে এসেছিলাম। ওধারের গাছটায় বাংলাদেশের একজন মন্ত্রীমশাই উঠেছেন, তাই ওটাতে উঠিনি, আপনার পাশের গাছেই উঠেছিলাম। বুড়ো মানুষ, বেশীক্ষণ গাছে থাকতে পারি না, তাই আমার বাঁদরটাকে সঙ্গে এনেছিলাম। ওটা পিছন থেকে আমার জামা ধরে রেখেছিল, যাতে হঠাৎ আছাড় না খাই। সকলকে হাততালি দিতে দেখে বাঁদরটা আমার জামা ছেড়ে দিয়ে তালি দিতে লেগেছে, তাই শরীরটাকে সামলাতে না পেরে গাছের ডালে ঝুলতে ঝুলতে আপনার কাঁধে নেমে পড়েছিলাম।' মামা উঠে দাঁড়ালেন।

'বাঁদরওয়ালা জিজ্ঞাসা করল, 'বাবুমশাই, ওই ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা লোকেরা কারা?' মামা বললেন, 'ওদের বলা হয় বিক্রমাদিত্য ক্লাবের দল; জঙ্গীপাড়ার কাছে ধোলাইগঞ্জে থাকে। ওদের জংলী জংলী চেহারা বটে, কিন্তু ওরা বড় সোজা আর আমুদে মানুষ। গোল খেয়েও ওরা কেমন ঝটপটাপট, ঝটপটাপট, ঝটপটাপট বগল বাজাচ্ছে!' তিনবার চেঁচিয়ে 'ঝটপটাপট' বলার ধাক্কায় মামার এমন স্বপ্নটা একেবারে ভেঙে গেল।'

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। স্বদেশলালের মামার স্বপ্নটার কথা ভাবতে ভাবতে ছাত্রেরা মহানন্দে ঝটপটাপট ঝটপটাপট বগল বাজাতে বাজাতে বাড়ির দিকে রওনা হল।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। স্বদেশের বুদ্ধি বাড়তে থাকে আর শরীর লম্বা হতে থাকে, কিন্তু তার জলযোগ আগে যেমন অদ্ভুত ধরনের ছিল ওমনি রয়ে গেল। গলা একটু গম্ভীর হয়ে এল, গল্পটল্প কমিয়ে দিল। শোনা যেত, সে কয়েক রকম জিনিস নিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত পরীক্ষা চালিয়ে দেখছে।

একদিন তার এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করল, 'তুই আজকাল ক্রমেই চুপচাপ হয়ে আসছিস কেন?' স্বদেশ উত্তর দিল, 'স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়ে স্কুল ছেড়ে বাবার-

আগে আমি তোদের এমন একটা অদ্ভুত ম্যাজিক বা এমন একটা সুন্দর আবিষ্কার দেখিয়ে যাব যে আমাকে তোরা চিরদিন মনে রাখবি।'

স্বদেশ তার আত্মীয়স্বজনদের বাড়ির আর পাড়ার বেড়ালগুলোর সঙ্গে খুব ভাব পাতিয়ে নিল। অনেক পরীক্ষা চালিয়ে চালিয়ে জেনে নিল যে তার চেনা বেড়াল-গুলোর মধ্যে কার গলার স্বর কতখানি মোটা আর কার কতখানি মিহি। হারমোনিয়মে সা রে গা মা পা ধা নি সা বাজিয়ে, বেড়ালগুলোর গলার স্বরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিল যে কোন্ কোন্ বেড়ালের গলার স্বর হারমোনিয়মের কোন্ পর্দার সুরের সঙ্গে মিলে যায়। পরে গান শেখাবার জন্য মোটা স্বরের আর মাঝারি স্বরের আর মিহি স্বরের বেড়ালগুলোকে পাশে পাশে এমন ভাবে সাজিয়ে বসিয়ে দিত যাতে এক এক করে তাদের ল্যাজে চাপ দিলে বেড়ালগুলো চিৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সার মতন 'ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও' সুর শুনতে পাওয়া যায়। স্কুলের বন্ধুদের সে কিছু জানতে দিত না। নিজেই বেড়ালদের গান শেখাত।

স্বদেশলাল বেড়ালদের হারমোনিয়ম বানাবার মতলব করেছে, তাই বেড়াল নিয়ে তার এত পরিশ্রম আর পরীক্ষা। এর জন্য সে কত কষ্টই না সহ্য করেছে। তাকে অনেকবার বেড়ালের আঁচড় আর কামড় খেতে হয়েছে। শেষে বেড়ালগুলো আর আঁচড় বা কামড় দিত না। সে মধ্যে মধ্যে তামাশা করে বলত, 'আমি শেষটায় বেড়ালতপস্বী হয়ে দাঁড়ালাম, আর বেড়ালগুলোও তপস্বী হয়ে উঠেছে।'

সে কারিগরদের দিয়ে কতকটা হারমোনিয়মের মতন দেখতে একটা যন্ত্র বানিয়ে নিল। যন্ত্রের উদরে হারমোনিয়মের পর্দার মতন চৌ-কোণা চৌ-কোণা কাঠের টুকরো লাগিয়ে দিয়ে প্রত্যেকটা টুকরোর সঙ্গে একটা-একটা ছোট্ট ডাণ্ডা এঁটে দেওয়া হল। প্রত্যেকটি ডাণ্ডার নীচ দিয়ে একটা-একটা খাঁজ বা সুরঙ্গ গিয়েছে। যন্ত্রের সামনে বেড়ালগুলোকে পেছন ফিরে বসিয়ে দিয়ে, তাদের ল্যাজ-গুলোকে যন্ত্রের খাঁজগুলোতে ঠেসে গুঁজে দিয়ে, সেই সুন্দর হারমোনিয়মের কল টিপে টিপে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট ডাণ্ডাগুলো নেমে নেমে বেড়ালগুলোর ল্যাজে ঘা দিতে থাকবে আর বেড়ালগুলো মোটা মিহি নানা স্বরে ডাকতে থাকবে। স্বদেশ বেড়ালগুলোকে সা-রে-গা-মা ভাঁজিয়ে ভাঁজিয়ে ওস্তাদ করে দিল।

কাজের মানুষের দিনগুলি তাড়াতাড়ি কেটে যায়, তাই স্বদেশলালের সময়ও বেশ তাড়াতাড়িই কেটে গেল। দেখতে দেখতে স্কুলের শেষ পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষার পরে ছেলেরা স্বদেশকে পাকড়িয়ে বলল, 'তোমার সেই নতুন ম্যাজিক বা

আবিষ্কারটা দেখাবে না?' স্বদেশ উত্তর দিল, 'আমি তো প্রস্তুত হয়েই আছি। তোমরা একটা সভার আয়োজন করো।'

সামনের শনিবারেই সভার আয়োজন করা হল। ছাত্রেরা এসেছে, মাস্টার মশাইরা এসেছেন, হেডমাস্টারমশাইও এসেছেন। স্বদেশলাল বেড়ালগুলোকে সঙ্গে নিয়ে আর হারমোনিয়ামের মতন যন্ত্রটা হাতে নিয়ে সভায় ঢুকতেই সভাময় একটা সাড়া পড়ে গেল। হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'ছেলেদের খুব বিশ্বাস যে স্বদেশ আজ একটা কিছু দারুণ রকমের ভেলকি-টেলকি দেখাবে।' ছাত্রেরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

স্বদেশ সকলকে নমস্কার করে বলল, 'পূজনীয় শিক্ষক মহাশয়গণ, আমার প্রিয় ছাত্রভাইয়েরা! আজ আমি সকলকে বেড়ালের হারমোনিয়াম বাজিয়ে শোনাতে এসেছি। এই নতুন রকমের হারমোনিয়ম সৃষ্টি করতে গিয়ে আমি অনেকদিন বেড়ালগুলোকে অনেক জ্বালাতন করেছি, বেড়ালগুলোও আমাকে অনেক জ্বালিয়েছে। প্রথম প্রথম ওরা রেগে যেত, ছটফট করত, আঁচড় কামড় দিত। ক্রমে অভ্যাস হয়ে যাওয়ার পরে বেশ ভদ্র হয়ে গিয়েছে। আমি হারমোনিয়মের কল টিপে টিপে বাজিয়ে যাই, আর বেড়ালগুলো ল্যাজে চাপ খেতে খেতে নানারকম ম্যাও ম্যাও স্বরে সা-রে-গা-মা ভাঁজতে থাকে, রাগ-টাগ করে না।'

বেড়ালগুলোকে ঠিকভাবে বসিয়ে দিয়ে, তাদের ল্যাজগুলো হারমোনিয়মের খাঁজে খাঁজে ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়ে স্বদেশ বাজাতে শুরু করল। তখন ঘরটা যেন স্বর্গ হয়ে গেল। সা-রে-গা-মা-র সুরে ম্যাও ম্যাও শব্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে, সকলে আনন্দে বুঁদ হয়ে বেড়ালের হারমোনিয়ম শুনছে আর দেখছে। ছাত্রেরা হাততালি দিতেও ভুলে গিয়েছে। হেডমাস্টারমশাই মনের আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে চিৎকার করে উঠলেন, 'স্বদেশ! তোমার নাম সারা জগতে ছড়িয়ে যাবে।' মাস্টারমশাইরা বললেন, 'বাস্তবিক আজ একটা দিন বটে!'

স্বদেশলালের উৎসাহ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালদের গলার তেজ বেড়ে যাচ্ছে। ম্যাও ম্যাও শব্দের স্রোতে সকলে হাবুডুবু খাচ্ছে। বেড়াল-কণ্ঠের ঝংকার ক্রমশই উঁচুতে উঠছে; গানের খোঁচা কানে এসে বিঁধছে, দেয়ালে গিয়ে ফুটছে, কড়ি-বর্গায় গিয়ে লাগছে। একজন ছাত্র আর স্থির থাকতে না পেরে বলে উঠল, 'স্বদেশদাদা, ব্যাপার যে শেষে গুরুচরণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

আধঘণ্টার মধ্যে সকলেই বেড়ালের হারমোনিয়মের গুঁতো হাড়ে হাড়ে টের

পেতে লাগল। এতক্ষণে বেড়ালদের চেহারাতেও একটা উৎকট রাগের ভাব আর দারুণ বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সা-রে-গা-মা ভাঁজতে ভাঁজতে ওরা হঠাৎ হঠাৎ ভীষণ ফ্যাস-ফ্যাস শব্দ করছে আব অস্বাভাবিক গর্জন ছাড়ছে। ওদের গা ফুলছে, চোখ জ্বলজ্বল করছে, নখ আব দাঁত চকচক করছে। তারপর? তারপরে যা হল তা শুনলে আক্কেলবুদ্ধি গুড়ুম হয়ে যায়! বিষম রাগের চোটে বেড়ালদের গা দিয়ে বুনো বুনো বাঘের গন্ধ বেবোতে লাগল!

হেডমাস্টারমশাই চিৎকার করে বললেন, 'স্বদেশ, আজ বুঝি একটা কিছু প্রলয় কাণ্ড ঘটে! একজন বড় শিকারীর কাছে শুনেছি যে বেড়ালেরা যখন রাগের ঠেলায় বাঘেব গন্ধ ছাড়তে থাকে তখন ওরা সব রকমের পাপ করতে পারে—

মানুষেব মাথায় টাক পড়িয়ে দিতে পাবে, জুতো ফেড়ে দিতে পাবে আর গোঁফ কেড়ে নিতে পারে, টনসিল চিরে দিতে পারে, নাক আর কান খেয়ে ফেলতে পারে, ভুঁড়ি ফাঁসিয়েও দিতে পাবে। এই বেলা সাবধান।'

স্বদেশকে সাবধান করে দেবার দবকার ছিল না। হেডমাস্টারমশাইয়ের কথা শেষ হতে না হতেই বেড়ালগুলোব নাক-মুখ দিয়ে একটা দুর্গন্ধ কটকটে বাষ্পের মতন জিনিস বেরিয়ে এসে স্বদেশেব নাকের মধ্যে ঢুকে গেল। সে এক নিমিষেই দশ হাত দূরে পালিয়ে গেল আর মাটিতে শুয়ে পড়ল। বেড়ালগুলো ভীম পরাক্রমে হেডমাস্টারমশাইকে টপকিয়ে, মাস্টারমশাইদের ডিঙিয়ে, ছাত্রদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে ইস্কুলের সেই নরকস্থল ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

স্বদেশকে সকলে ধরাধরি করে ওঠাল। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে সে সুস্থ হল। হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'স্বদেশ, তুমি প্রতিজ্ঞা করো যে ভবিষ্যতে এমন কাণ্ড করবে না। তোমার হারমোনিয়মটা স্বর্গের খেলনা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নরকে

নিয়ে যায়।' স্বদেশ বলল, 'আমি নাকে খত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, আমার সাধের আবিষ্কারের কাছে আমি চিরবিদায় গ্রহণ করলাম। আমার বেড়াল শিষ্যেরা আমাকে আজকে ক্ষমা করুক আর শান্তিতে থাকুক।' সকলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বাড়ি ফিরে গেল।

স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাস করে স্বদেশলাল কলেজে ভর্তি হল। বিদ্যালাভের সঙ্গে তার দুটি অমূল্য সম্পত্তি লাভ হল; সে দুটি হচ্ছে তার সুদীর্ঘ সুশ্রী গোঁফ আর সুন্দর সুবিশাল দাড়ি। গোঁফ জোড়ার ডগা দু কানে বেঁকিয়ে রেখে সে বলল, 'এ হচ্ছে আমার কানপাট্টা গোঁফ।' লম্বা দাড়ির ডগাটা সে পকেটে রুমালের মত গুঁজে রেখে দিত। খাওয়া-দাওয়ার পরে মুখ ধুয়ে রুমালের বদলে দাড়ি দিয়ে মুখ মুছে আবার পকেটের মধ্যে দাড়ির ডগা গুঁজে রেখে দিত।

ওইরকম গোঁফ দাড়ি নিয়ে ক্লাসে বসবার অনুমতি পেতে তাকে বেশ চেষ্টা করতে হয়েছিল। কলেজের অধ্যক্ষমশাই জানতেন যে সংসারের লোকদের সঙ্গে স্বদেশের তুলনা করা চলে না, তাই তিনি অনেক ভেবে শেষটায় অনুমতি দিলেন।

একদিন বিকেলে স্বদেশলাল কলকাতার দক্ষিণে টালিগঞ্জে বেড়াতে বেড়াতে এক গাছতলায় একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর দেখা পেল। দেখা হওয়া মাত্র দুজনেই একেবারে অবাক! স্বদেশ মুগ্ধ হয়ে সন্ন্যাসীর সাদা দাড়ি আর সাদা জটা দেখছে, আর সন্ন্যাসী গভীর স্নেহের সঙ্গে স্বদেশের অপরূপ গোঁফদাড়ি দেখছেন। কারো মুখে কথা নেই। দশ মিনিট এইভাবেই কেটে গেল। সেদিন স্বদেশ কাছে যেতে সাহস পেল না; সন্ন্যাসীর কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে এল।

পরদিন কলেজে গিয়ে বন্ধুদের বলল, 'একটা সন্ন্যাসী দেখে এলাম, একেবারে সেরা সাধু। শিবের মত জ্ঞানী, সমুদ্রের মতন গম্ভীর, নারদ ঋষির মতন সাদা দাড়ি আর সাদা জটা, চাঁদের মতন স্নিগ্ধ চোখ। আজ আবার দেখতে যাব। শুনেছি, রোজ গাছতলায় এসে বসেন। কাল তাঁকে প্রণাম করা হয়নি। দশ মিনিট শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম; আর তিনিও সজ্ঞানে আমাকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখছিলেন।'

পরদিন বিকালে স্বদেশের বন্ধুরা খেলার মাঠে গেল, আর সে একা সেই সাধুর কাছে গেল। তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি স্বদেশের দাড়িতে হাত বুলিয়ে একটু আদর করলেন আর বললেন, 'একা এসেছ ভালোই করেছ। আজ তোমাকে

বিনামূল্যে একটা আশ্চর্য জিনিস দেব যা পৃথিবীতে আর কারো কাছে নেই। তোমাকে দেখেই বুঝেছি যে একমাত্র তুমিই এই জিনিসটাকে কাজে লাগাতে পারবে। আজকাল পৃথিবীতে এই ধরনের জিনিস একমাত্র এটিই আছে।'

সন্ন্যাসী ঠাকুর খুব জোরে জোরে তাঁর সাদা দাড়ি ঝাড়তে লাগলেন। একটু পরেই দাড়ি থেকে একটা কৌটো বেরিয়ে এল, আর কৌটোটা খুলতেই রজনের মতন দেখতে এক টুকরো জিনিস বেরিয়ে এল। সাধু বললেন, 'এই জিনিসটা তোমার দাড়িতে রোজ একঘণ্টা ধরে ঘষবে। দুই মাস এইরকম করলেই তোমার দাড়িতে এক শক্তির খেলা দেখতে পাবে। তখন বাঁ হাতে দাড়িটাকে টান করে ধরবে আর ডান হাতে দাড়ির উপর দিয়ে বেহালার ছড়ি বোলাতে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গেই নানারকম নতুন নতুন অচেনা সুর শুনতে পাবে।'

স্বদেশের হাতে কৌটোটা সমেত জিনিসটা দিয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুর বললেন, 'যাকে তাকে আর যেখানে সেখানে দাড়ির বাজনা শোনাবে না ; এই বাজনার একটা গৌরব আছে, পবিত্রতা আছে। নারদমুনি চোখ বুজে অনেকদিন তপস্যা করে-ছিলেন, আর সেই সুযোগে তাঁর দাড়িতে কুমুরে পোকা বাসা বানিয়েছিল। তপস্যা শেষ হলে তাঁর দাড়ির দিকে খেয়াল গেল আর পোকা পালিয়ে গেল। তখন নারদমুনি কুমুরে পোকার বাসার সঙ্গে একটা বনৌষধির রস মিশিয়ে এই গুটিকা প্রস্তুত করলেন। গত চার হাজার বছরের মধ্যে মাত্র পাঁচজন অতি পুণ্যবান আর সৌভাগ্যবান লোক এই জিনিসটি ব্যবহার করবার অধিকার পেয়েছে। এটির নাম নারদকপো গুটিকা। এর সামান্য একটু বাকী রয়েছে ; সেটুকু তোমাকে দিলাম।'

স্বদেশ গড় হয়ে সাধুকে প্রণাম করল। সাধু আবার বললেন, 'একবার দাড়িতে শক্তি এসে গেলে প্রতিদিন গুটিকা ঘষবার দরকার থাকবে না ; শুধু দাড়িতে বেহালার ছড়ি চালিয়ে দিলেই সুর বেরোবে। কয়েক মাস পরে যখন দাড়ির তেজ মিইয়ে আসবে আর সুর ঢিমিয়ে আসবে, তখন শুধু এক সপ্তাহ গুটিকা ঘষলেই দাড়ি আবার জ্যান্ত হয়ে উঠবে। একটা কথা মনে রাখবে—দাড়িতে যেন কিছুতেই চামচিকে না বসে। একবার চামচিকার খপ্পরে পড়লে কিন্তু দাড়ি একেবারে ভেস্তিয়ে যাবে, তুমিও পস্তাতে থাকবে।'

সাধু আর এদিকে আসবেন না, তাই স্বদেশ তাঁকে খুব ভালো করে প্রণাম

করল। বাড়ি ফিরেই স্বদেশ দাড়িতে সেই গুটিকা ঘষতে লাগল। রোজ এক-ঘণ্টা খুব উৎসাহের সঙ্গে দাড়িতে ঘষে। তার চেহারায় কিছুদিনের মধ্যেই একটা তেজের ভাব আর এক আনন্দের চিহ্ন দেখা দিল। ক্লাসে বন্ধুরা আর অধ্যাপক মহাশয়েরা মধ্যে মধ্যে বলতেন, 'স্বদেশ, তোমাকে এক নতুন মানুষ মনে হচ্ছে। উন্নতি করছ? বেশ, বেশ, উন্নতিই কর।'

দুই মাস পরে স্বদেশের মনে হল যেন তার দাড়িতে কেউ আশীর্বাদ ঢেলে দিল, একটা প্রাণের লক্ষণ এসে গেল—কেমন একটা জ্যান্ত জ্যান্ত ভাব। সে ছুটে গিয়ে বেহালার ছড়িটা হাতে নিল আর দাড়ির উপরে সেটা চালাতে লাগল। প্রথমে কয়েকটা ঝিঁঝিঁপোকার ডাকের মতন একটা শব্দ শোনা গেল, কিন্তু অনেক বেশী মিষ্টি। পরে অস্পষ্ট হাসির মতন সুন্দর শব্দ—হা হা হা হা, হো হো হো হো, হি হি হি হি, হে হে হে হে। শেষে নানা অচেনা বাজনার নতুন নতুন স্বর! স্বদেশ বাঁ হাতে দাড়িটাকে বেশ জোরে টেনে ধরে ডান হাতে সমানে ছড়ি বুলিয়ে যেতে লাগল। সন্ন্যাসী বলেছিলেন, 'এই বাজনা শুনে শুনে তোমার অশেষ উন্নতি হবে। হিংস্র জানোয়ারেরা এই বাজনা শুনে ঘুমিয়ে পড়বে, সিংহ বাঘেরা পর্যন্ত গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়বে।' বাজাতে বাজাতে সাধুর কথায় স্বদেশের বিশ্বাস বেড়ে যেতে লাগল। রোজ অভ্যাস চলতে লাগল।

একদিন স্বদেশ খবরের কাগজে সিদ্ধিগড়ের রাজার একটা বিজ্ঞাপন দেখতে পেল। রাজা জানাচ্ছেন যে তিনি ভয়ানক হিংস্র বাঘিনীকে ধরে খাঁচায় রেখেছেন; যে কেউ ওই খাঁচায় ঢুকে বাঘিনীর পায়ে আলতা পরিয়ে আসতে পারবে তাকে তিনি সোনার মেডেল উপহার দেবেন।

স্বদেশলাল বন্ধুদের কিছু না জানিয়ে, শুধু নিজের বাড়ির লোকদের একটু জানিয়ে রেখে সিদ্ধিগড়ের দিকে রওনা হল। রেলগাড়িতে সাতাশি মাইল, বাস ধরে কয়েক মাইল, আর হেঁটে তিন মাইল যেতেই সে সিদ্ধিগড়ে এসে গেল। মনে তার যেমনি উৎসাহ তেমনি সাহস, একেবারে রাজসভায় গিয়ে হাজির। তার চেহারা দেখে রাজা অবাক। সভার লোকেরা সবাই অবাক।

স্বদেশলাল বাঘিনীর খাঁচায় ঢুকবার মতলব জানাতেই রাজা বললেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, তুমি এ কাজ পারবে কেন? শেষে একটা বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়বে। তোমাকে দেখে আমাদের বড্ড মায়া হচ্ছে।'

স্বদেশ উত্তর দিল, 'আপনারা আমার বিদ্যেটা দেখবেন। আমি যদি বাঘিনীকে ভোলাতে পারি তবেই আপনাদের অনুমতি নিয়ে খাঁচায় ঢুকব।' রাজা

আপত্তি করলেন না। স্বদেশকে নিয়ে সকলে বাঘিনীর খাঁচার ধারে গেল। ওঃ! সেটা একটা বাঘিনী বটে। একেবারে বাঘের রাজ্যের রানী! সারা শরীরে তেজ খেলে যাচ্ছে, চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক, পান খেয়ে ঠোঁট লাল।

স্বদেশ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বাঘিনী পান খায়?' রাজা বললেন, 'আগে খেত না। একবার এক শিকারী পানের খিলি সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে গিয়েছিল। বাঘিনী শিকারীকে মেরে তার মাংস খেয়ে পানটা পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিল। সেদিন বাঘিনীর খুব হজম হয়েছিল। পানের গুণ জানতে পেয়ে বাঘিনীটা কয়েকদিন মানুষ মেরে পানের খোঁজ করেছিল, কিন্তু তাদের সঙ্গে পান ছিল না। একদিন মহিষের মাংস খেয়ে পেট ভার হওয়াতে বাঘিনীটা একটা পানের দোকান লুট করে ভালো ভালো সাজা পান খেয়ে সুস্থ হয়। এইসব কথা শুনেছিলাম, তাই রোজ ওর খাওয়া হলে ওকে পান সেজে দেওয়া হয়।'

স্বদেশ বলল, 'এবার আমি কাজ আরম্ভ করি।' দাড়িটাকে বজ্রমুষ্টিতে ধরে জোরসে টেনে বাগিয়ে রেখে, দাড়িতে ছড়ি চালাতে চালাতে সে এমন সব সুর শোনাতে লাগল যা অন্যের কানে আগে কোনদিন ঢোকেনি। দাড়ির এমন দিব্য শক্তি দেখে রাজা, মন্ত্রী, কোটোয়াল সকলেই একটা আনন্দের নেশায় বিভোর হয়ে গেল। বাঘিনীর চেহারা অনেকটা মোলায়েম হয়ে এল, মুখে একটা হাসি-হাসি ভাব দেখা দিল, চোখ একটু একটু ছলছল করতে লাগল। ক্রমে তার চোখ আরামে বুজে আসতে লাগল, ঘর্‌ঘর্‌ করে একটা আরামের ডাক ডাকতে লাগল।

শেষে ঘুমের ঘোরে শুয়ে পড়ে গাঁক গাঁক করে নাক ডাকতে লাগল। তাই দেখে রাজা, মন্ত্রী, কোটোয়াল, এদের ধিঙ্গি-ধিঙ্গি ধিঙ্গি-ধিঙ্গি করে কী নাচ!

আবার নাচ দেখে রানীর খিল-খিল-খিল করে কী হাসি! কী হাসি! কী হাসি!

স্বদেশ ব্যস্ত হয়ে বললে, 'আপনারা থামুন, থামুন! বাঘিনীর ঘুম ভেঙে যাবে।' শুনেই সকলে শান্ত হয়ে গেল। খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে স্বদেশ একটা কাঠি দিয়ে বাঘিনীর মাথায় জোরে জোরে টোকা মেরে দেখতে পেল যে বাঘিনী আর নড়েনা-চড়েনা; একেবারে কুম্ভকর্ণের দিদিমার মতন ঘুমোচ্ছে। তখন সে খাঁচায় ঢুকে খুব যত্নের সঙ্গে বাঘিনীর পায়ে আলতা মাখিয়ে দিয়ে, ঘুমন্ত বাঘিনীকে প্রণাম করে বিজয়ী বীরের মতন খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল। সকলে মিলে তখন কী আনন্দ!

স্বদেশকে নিয়ে সিদ্ধিগড়ে এক সপ্তাহ খুব উৎসব করা হল। পরে রাজা তাকে সোনার মেডেল দিলেন! ফিরে আসবার আগের দিন রাজার বাগানে স্বদেশ একটা নতুন রকমের গাছ দেখতে পেল। সে গাছের কাছে এগিয়ে যেতেই একটা চামচিকা নেমে এসে তার দাড়িতে ঢুকে গিয়ে লটকিয়ে রইল। স্বদেশ যতই দাড়ি ঝাড়ে, চামচিকা ততই জোরে দাড়ি আঁকড়িয়ে ধরে আর ফড়র্ ফড়র্ করে। সে এক বিদ্‌ঘুটে অবস্থা। গাছটার কাছেই রাজার দারোয়ানের রান্নাঘরে রান্না চড়েছে। স্বদেশলাল ছুটে সেখানে গিয়ে দারোয়ানের কাছে সাহায্য চাইল। দারোয়ানজী স্বদেশের দাড়ি কেটে দেবার জন্য একটা কাঁচি আনতে গেল। এদিকে উনুনের মধ্যে একটা লঙ্কা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেদিকে কারো খেয়াল যায় নি। দারোয়ান ফিরতে না ফিরতেই লঙ্কার কড়া ধোঁয়া বেরিয়ে চামচিটাকে এমন অস্থির করে দিল যে সেটা ডাকাতের মতন খানিকটা দাড়ি ছিঁড়ে নিয়েই পালিয়ে গেল।

স্বদেশ সেই মুহূর্তেই টের পেল যে তার দাড়িতে আর জ্যান্ত জ্যান্ত ভাব নেই। ছড়ি চালিয়ে দেখতে পেল যে দাড়িতে আর সাড়া পাওয়া যায় না, সুর আর বেরোয় না। সে বিমর্ষ হয়ে আয়নার সামনে গিয়েই দেখতে পেল যে দাড়ির খানিকটা খুবলে যাওয়াতে অতি বিটকেল চেহারা হয়েছে।

সকলের পরামর্শে স্বদেশ তখন দাড়ি কামিয়ে নিল আর গোঁফ ছাঁটিয়ে নিল। তার চেহারা তখন অনেক বেশী ভাল দেখাতে লাগল। তাই দেখে রাজা, মন্ত্রী, কোটোয়াল, সকলের ধিঙ্গি-ধিঙ্গি-ধিঙ্গি-ধিঙ্গি করে কী নাচ। কী নাচ! কী নাচ! আর তাই দেখে রানীর খিলখিল খিলখিল করে কী হাসি! এবারে স্বদেশ তাদের আর মানা করতে পারছে না; এখন তো বাঘিনী জেগে যাবার ভয় নেই।

সিদ্ধিগড়ের রাজার আর রাজ্যের সব লোকের কাছে অনেক স্নেহযত্ন পেয়ে, সোনার মেডেল আর বাঘিনীর স্মৃতি নিয়ে স্বদেশ কলকাতায় ফিরে এল। তার আত্মীয়স্বজন, তার কলেজের বন্ধুরা আর অধ্যাপক মহাশয়রা তার সুশ্রী চেহারা দেখে খুব খুশী। সে আর দাড়ি রাখলই না দেখে আরো খুশী। দাড়ি হারাবার কারণটা সে একটু একটু করে সকলকে জানিয়ে দিয়েছিল। সহজ সরল মানুষ!

রয়াল বেঙ্গল বেজী

রয়াল বেঙ্গল বেজী
দয়াল, পিঙ্গল, তেজী।
বাঘের মুড়োয় হাত
বুলিয়ে জুড়োয় বাত।
ঘুঘুর আয়েস তরে
সাগুর পায়েস করে।
ব্যাঙের নরম গালে
ঝিঙের মলম ডলে।
চোরের পকেট কাটে,
বরের লকেট ঘাঁটে।
পাজির জুলপি টানে,
কাজীর কুলপি আনে।
খোঁড়াকে সেলাম করে,
ঘোড়াকে নিলাম করে।
উকিলের ডান কানে
কোকিলের গান হানে।

ইলিশের মাড়ী মাজে,
পুলিসের বিড়ি সাজে।
উকুনের থাবা মোছে,
শকুনের গ্রীবা পোঁছে।
কুমিরের নাকে হাঁচে,
আমিরের টাকে নাচে।
মহিষের নাড়ী টেপে,
সহিসের দাড়ি মাপে।
সজারুর কণ্ডু ঘষে,
গাঁজারুর পাণ্ডু নাশে।
বড় বেশি তার দয়া
তারো বেশি তার হায়া
যশোমান নাহি চায়,
স্তুতিগান নাহি সয়।
সে কারণে ভাই আমি
এইখানে যাই থামি।
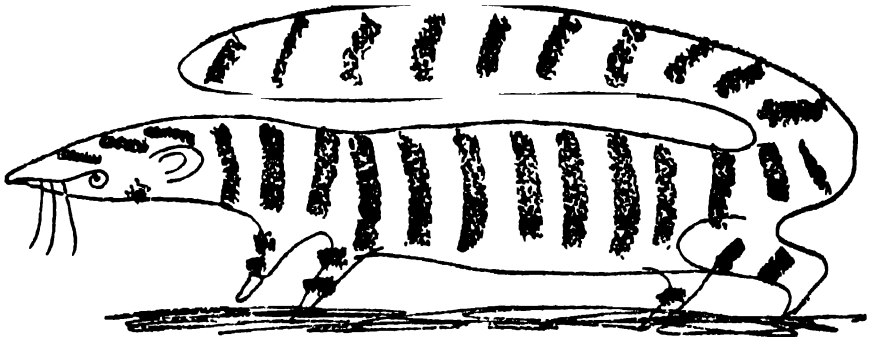
উপেন্দ্রকিশোর রায়ের কথা

তোমরা 'সন্দেশ' পত্রিকায় স্বর্গত উপেন্দ্রকিশোর রায়ের লেখা অনেক ভাল ভাল গল্প পড়েছ আর তাঁর আঁকা ভাল ভাল ছবি দেখেছ। তিনিই 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে 'সন্দেশ' যখন প্রথম ছাপা হয়ে সকলের হাতে গেল, তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন খুশি হল, বড়দের মনেও তেমনি আনন্দ হল। ছেলেমেয়েরা যাতে আনন্দ পায়, যাতে তাদের জ্ঞান বাড়ে আর বুদ্ধি খোলে, 'সন্দেশ' পত্রিকায় তিনি সেইরকম সব ব্যবস্থা করেছিলেন। তখনকার ছেলেরা এখন বুড়ো হয়ে এসেছে, কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরের কথা তারা ভুলতে পারেনি। তাঁর গলার গান আর বেহালার সুর শুনে মানুষের মন আনন্দে ডুবে যেত।

ইংরাজী ১৮৬৩ সনে ১২ই মে তাঁর জন্ম হয়—এখন থেকে ঠিক ১০০ বছর আগে। তাই এই বছরে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর উৎসব করা হচ্ছে।

তিনি দেখতে বড়ই সুন্দর ছিলেন—ফরসা রঙ, সুন্দর কালো দাড়ি, বলিষ্ঠ শরীর; মুখের ভাব শান্ত, প্রসন্ন, উজ্জ্বল; চোখের চাহনি জ্ঞানী মানুষের মতন স্থির আর গভীর, কিন্তু স্নেহে ভরা। দেখলেই বোঝা যেত যে তাঁর মনটা খুব উঁচু। আর মনের জোর খুব বেশী। সদানন্দ গুণী পুরুষের শ্রেষ্ঠ লক্ষণগুলি তাঁর চেহারায় জ্বলজ্বল করত।

তাঁর কথাবার্তা খুব চমৎকার ছিল। লোকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বড় সুখী হত। বেশী কথা বলতেন না, কিন্তু যা বলতেন তা শুনেই সকলের প্রাণ ভরে যেত। তাঁর কথায় বা ব্যবহারে কিছুমাত্র অহংকারের চিহ্ন দেখা যেত না। তাঁর সামনে কেউ অন্যায় কাজ করতেও সাহস পেত না। দুষ্টু লোকদের খারাপ কাজ করতে দেখলে তাঁর গলার স্বর এমন গম্ভীর আর চেহারা এমন তেজীয়ান হয়ে যেত যে দুষ্টুলোকেরা ভয়ে ভয়ে সেই মুহূর্তেই সাবধান হয়ে যেত।

পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ সাবডিভিশনে মসুয়া গ্রাম। এই গ্রামের প্রসিদ্ধ রায়-বংশে উপেন্দ্রকিশোরের জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষেরা বিদ্বান, গুণী, মহৎ লোক ছিলেন। আদতে এঁদের বংশের পদবী ছিল 'দেব'; এঁরা কায়স্থ ছিলেন। লোকের কাছে এঁরা রায় উপাধিতেই পরিচিত ছিলেন।

পূর্বপুরুষদের কেউ কেউ পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ পাঠান জমিদার ঈশা খাঁর জমিদারির একটা কাছারিতে কাজ করেছিলেন, তাই 'খাসনবিশ' আর 'মজুমদার' উপাধিও পেয়েছিলেন।

উপেন্দ্রকিশোরের প্রপিতামহ (অর্থাৎ ঠাকুরদাদার বাবা) রামকান্ত রায় বা রামকান্ত মজুমদার বাংলা, সংস্কৃত, আরবী আর পারসী ভাষায় খুব পণ্ডিত ছিলেন। ইনি খুব সুন্দর আর বলবান পুরুষ ছিলেন। শোনা যায়, ইনি সকালে স্নানের পর জলযোগে ধামাভরা খই আর একটা আস্ত কাঁঠাল খেতেন। গান-বাজনাতেও এঁর খুব সুনাম ছিল।

রামকান্তের দ্বিতীয় পুত্র লোকনাথ ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের পিতামহ বা ঠাকুরদাদা। লোকনাথও বাংলা, সংস্কৃত, আরবী, পারসী ভাষা খুব ভাল জানতেন। তিনি অঙ্কশাস্ত্রও ভাল জানতেন। গান গাইতে আর খোল বাজিয়ে কীর্তন করতে ভালবাসতেন। লোকনাথ যোগী ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে শ্মশানে গিয়ে জপ করতেন আর যোগের ক্রিয়া অভ্যাস করতেন। এই সব অভ্যাসের জন্য তিনি গুরুর কাছে বই, জপের মালা, আর অন্য কতকগুলো জিনিস পেয়েছিলেন।

একটি ছেলে জন্মাবার পরে লোকনাথ শ্মশানে বেশী বেশী যেতে আরম্ভ করলেন। তাই দেখে তাঁর বাবা রামকান্ত ভয় পেলেন; তিনি ভাবলেন যে লোকনাথ সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন। তিনি লোকনাথের যোগের বই আর যোগ-সাধনার অন্য কতকগুলো জিনিস নদীতে ফেলে দিয়ে ভাবলেন যে লোকনাথ আর শ্মশান যাবেন না, কাজে মন দেবেন। কিন্তু এর ফল অন্যরকম হল; লোকনাথ উপবাস করে জপ করতে করতে দেহত্যাগ করলেন। মারা যাবার আগে তিনি রামকান্তকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আমার যে একমাত্র ছেলেটিকে আমি রেখে গেলাম, তার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে আর নাতি হবে; আমাদের একশত বংশধর হবে।' সত্যিই ক্রমে অনেক বংশধর হয়েছে।

লোকনাথের সেই একমাত্র পুত্র শ্যামসুন্দর রায় (বা শ্যামসুন্দর মুন্সী) ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের পিতা। শ্যামসুন্দর তাঁর পূর্বপুরুষদের রূপ, গুণ, বিদ্যা, বল আর সুনাম পেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা নানা বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে আসতেন। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না, কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে শাস্ত্র নিয়ে তর্ক বাধলে তাঁরা শ্যামসুন্দরকে বিচার-সভায় সাহায্যের জন্য ডাকতেন, আর সেখানে তাঁর কথা মেনে চলতেন। বিদ্বান মুসলমানেরা তাঁর কাছে আরবী আর

পারসী দলিলের আর ফরমানের ঠিক ঠিক মানে বুঝে নিতে আসতেন। তিনি কিশোরগঞ্জে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে সেরেস্তাদার ছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের মায়ের নাম ছিল জয়তারা।

উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন শ্যামসুন্দরের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর বড় ভাই সারদারঞ্জন রায় কয়েক জায়গার কলেজে পড়িয়ে শেষে কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে আর সংস্কৃতে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন। হাতে ক্রিকেট ব্যাট, মুখে জমকালো দাড়ি, বলবান শরীর নিয়ে তেজীয়ান ভঙ্গিতে চলা-ফেরা, খেলার মাঠে সারদারঞ্জনের এই চেহারা যারা দেখেছিল তারা সারাজীবন মনে রেখেছিল। অনেকে তাঁর কাছে ক্রিকেট খেলা শিখে নিয়ে ভাল খেলোয়াড় হয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই তখন বাঙালীদের মধ্যে ক্রিকেট খেলায় উৎসাহ আর উন্নতি দেখা গিয়েছিল, তাই তাঁকে 'ফাদার অব বেঙ্গলী ক্রিকেট' বলা হত। ছাত্রদের শিখবার সুবিধার জন্য তিনি অঙ্কশাস্ত্রের ভাল বই লিখেছিলেন, আর কলেজের ছাত্রদের সংস্কৃত বইয়ের ভাল ব্যাখ্যা লিখে তাদের সংস্কৃত ভাষা শেখার সুবিধা করে দিয়েছিলেন। তিনি 'বিদ্যাবিনোদ' আর 'সিদ্ধান্তবাচস্পতি' উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি কয়েকবার স্বপ্নে ভবিষ্যতের ঘটনা দেখতে পেয়েছিলেন ; তাঁর স্বপ্ন ঠিক ঠিক মিলে গিয়েছিল।

সারদারঞ্জন আর উপেন্দ্রকিশোরের পরেই তাঁদের ভাই মুক্তিদারঞ্জন। ইনিও অঙ্কশাস্ত্র খুব ভাল জানতেন আর বিদ্যাসাগর কলেজে পড়াতেন। ক্রিকেট আর ফুটবল খেলায় এঁর খুব নাম হয়েছিল। খেলার মাঠে এঁর দাড়িও সকলের চেনা হয়ে গিয়েছিল। ইনি কথা কম বলতেন আর সহজে জোরে কথা বলতেন না! তবে এঁর কথাবার্তা আর গল্প বড় মিষ্টি ছিল। মুক্তিদারঞ্জনের শান্তশিষ্ট চেহারা ছিল, কিন্তু তাঁর গায়ে খুব জোর ছিল। তিনি খুব তাড়াতাড়ি ছুটতে পারতেন। পূর্ববঙ্গে খাটাস (খট্টাস) জাতীয় একরকম জন্তু পাওয়া যায়, তাকে 'বাঘাল্লিয়া' বলে। শুনেছি মুক্তিদারঞ্জন একবার একটা বাঘাল্লিয়াকে তাড়া করে ছুটতে ছুটতে সেটার ল্যাজ ধরে ফেলেছিলেন।

মুক্তিদারঞ্জনের পরে তাঁদের ভাই কুলদারঞ্জন রায়। ইনি চমৎকার ছবির কাজ (ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট) করতেন। ইনিও ভাল ক্রিকেট খেলতে পারতেন। ইনি কতকগুলো বিখ্যাত ইংরাজী গল্পের বইয়ের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। সেই সব বই—'ইলিয়াড,' 'ওডিসিউস,' 'রবিনহুড,' 'অজ্ঞাত জগৎ,' 'শার্লক হোমসের বিচিত্র কাহিনী', 'ব্যাস্কারভিলের কুক্কুর'—পড়ে সকলে খুব আনন্দ পেত।

কুলদারঞ্জন 'বত্রিশ সিংহাসন,' 'পুরাণের কথা,' 'পঞ্চতন্ত্র,' 'বেতাল পঞ্চবিংশতি,' আর 'কথাসরিৎসাগর' অনেকটা সহজ করে লিখেছিলেন। এইসব গল্প অনেকদিন আগেই আমাদের দেশে রচিত হয়েছিল, কিন্তু অনেকেই এগুলো পড়েনি। কুলদারঞ্জনের লেখায় সকলে এইসব গল্প সহজে জানবার সুবিধা পেয়েছে।

এর পরে তাঁদের সবার ছোট ভাই প্রমদারঞ্জন রায়। স্কুলে-কলেজে থাকতে তাঁর ফুটবল খেলায় অদ্ভুত উৎসাহ ছিল। খেলতে খেলতে একবার তাঁর সামনের একটা কি তুটো দাঁত ভেঙে পড়ে গিয়েছে, একবার পাঁজরের সবচেয়ে উপরের হাড় (কলার-বোন) ভেঙে গিয়েছিল, একবার হাঁটুর হাড় সরে গিয়েছিল। পরে ভাঙা হাড় জোড়া লেগে যায়, হাঁটু ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু ভাঙা দাঁতের ফোকলা জায়গায় আর নতুন দাঁত গজায়নি; নকল দাঁত বানিয়ে নিতে হয়েছিল। তিনি এঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে ভারত সরকারের জরিপ-বিভাগে কাজ করতেন।

প্রমদারঞ্জন রায়

এই কাজে তিনি খুব সততা আর সাহস দেখিয়ে সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁকে বনজঙ্গলে আর পাহাড়ে ঘুরে কাজ করতে হত। সেখানে যেসব বন, পাহাড়, জীবজন্তু, নতুন নতুন মানুষ আর অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা দেখতেন, সব কিছুর কথা লিখে পাঠিয়ে দিতেন। সেগুলো 'সন্দেশ' পত্রিকায় ছাপা হত; লেখাগুলোকে 'বনের খবর' বলা হত। 'বনের খবর' এখন বইয়ের আকারে ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। তাঁর মেজো মেয়ে লীলা মজুমদারের লেখা অনেক গল্প তোমরা পড়েছো। কুলদারঞ্জন আর প্রমদারঞ্জন প্রথম জীবনে দাড়ি রাখতেন, কিন্তু পরে আর রাখতেন না।

উপেন্দ্রকিশোরের তিন বোন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শুধু সবচেয়ে ছোট বোন মৃণালিনী বসু (স্বর্গত হেমেন্দ্রমোহন বসুর পত্নী) এখন পর্যন্ত বেঁচে আছেন; ৮৬ বছর বয়স।

খুব ছেলেবেলায় উপেন্দ্রকিশোরের নাম ছিল কামদারঞ্জন রায়। পরে একটি বিশেষ কারণে তাঁর নাম বদলিয়ে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী নাম রাখা হয়। সেই কারণটির কথা বলা হচ্ছে।

মসূয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরীর অনেক বছর পর্যন্ত কোন ছেলে হয় নি। তাই তাঁর এই ভাবনা হল যে এতবড় সম্পত্তি তিনি কাকে দিয়ে যাবেন! তাই তিনি একটি পোষ্যপুত্র রাখতে চাইলেন অর্থাৎ অন্যের একটি ছেলেকে চেয়ে নিয়ে মানুষ করে তাকেই সম্পত্তি দিয়ে যাবেন বলে ঠিক করলেন। তিনি তাঁর জ্ঞাতিভাই শ্যামসুন্দর রায়ের কাছ থেকে কামদারঞ্জনকে চেয়ে নিয়ে তাকেই নিজের ছেলের মতন পালন করতে লাগলেন। তখন হরিকিশোরের নামের সঙ্গে মিল রেখে কামদারঞ্জনের নাম রাখা হয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। উপেন্দ্রকিশোরের বয়স তখন চার-পাঁচ বছর মাত্র। হরিকিশোর নিষ্ঠাবান হিন্দু আর বিজ্ঞ লোক ছিলেন, তাই ময়মনসিংহের নানা সামাজিক ব্যাপারে আর সভা-সমিতিতে লোকেরা হরিকিশোরকে ডেকে নিয়ে যেত আর একজন প্রধান ব্যক্তি বলে গণ্য করত।

এর সাত বছর পরে হরিকিশোরের নিজের একটি ছেলের জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয় নরেন্দ্রকিশোর। উপেপন্দ্রকিশোর আর নরেন্দ্রকিশোর সহোদর ভাই না হলেও দুজনের মধ্যে সদ্ভাব ছিল। নরেন্দ্রকিশোর বরাবর উপেন্দ্রকিশোরকে নিজের বড় ভাইয়ের মতন মান্য করেছিলেন আর উপেন্দ্রকিশোরও তাঁকে খুব বিশ্বাস আর স্নেহ করতেন।

বড় হয়ে নরেন্দ্রকিশোরই মসূয়ার জমিদারি চালাতেন, তিনি নিজের জমি-দারিও দেখাশোনা করতেন, আবার উপেন্দ্রকিশোরের ভাগের জমি দেখাশোনার ভারও তিনি উপেন্দ্রকিশোরের কাছেই পেয়েছিলেন।

একটু বড় হয়ে উপেন্দ্রকিশোর যখন ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে পড়তে গেলেন তখন নিজের খাতায় খেয়ালের বশে নানারকম ছবি আঁকতেন। একদিন একজন উচ্চপদের ইংরেজ সেই স্কুল দেখতে এলেন। সাহেব ক্লাসে ঢুকে ছেলেদের প্রশ্ন করছেন, আর সেই ফাঁকে উপেন্দ্রকিশোর সাহেবের ছবি এঁকে ফেলেছেন! সাহেব ভাবলেন বালকটি খাতায় বুঝি অঙ্ক-টঙ্ক কষছে; তাই তিনি সেই খাতাটা দেখতে

চাইলেন। সেই ক্লাসে একটি শিক্ষক মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। ভাবলেন যে সাহেব বুঝি খাতায় নিজের ছবি দেখে রেগে যাবেন। সাহেব কিন্তু উপেন্দ্র-কিশোরের আঁকা ছবিটা দেখে বড়ই খুশী হয়ে বললেন, 'তুমি ছবি আঁকার অভ্যাস ছাড়বে না ; বড় হলে তুমি খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারবে।'

স্কুলে থাকতেই উপেন্দ্রকিশোর বেহালা আর বাঁশি বাজাতে খুব ভালবাসতেন। তিনি বেহালা বাজিয়ে আর খেলা করে অনেকখানি সময় কাটাতেন।

একদিন তাঁর এক গুরুজন (সম্ভবত তাঁর শিক্ষক) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা উপেন্দ্র ! তুমি তো বেহালা আর খেলাধুলো নিয়ে অনেকখানি সময় কাটাও অথচ ক্লাসে প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তরও দিয়ে থাক ; তুমি পড়া তয়ের কর কখন ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার ঘরে আমাদের ক্লাসের একজন ছেলে চেঁচিয়ে পড়া তয়ের করে, আমি শুনতে পাই ; ওতেই আমার পড়া শেখা হয়ে যায়।' তাঁর এইরকম অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল।

অনেকে ভয় করেছিলেন যে উপেন্দ্রকিশোর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করতে পারবেন না। একজন তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন যে পরীক্ষা কাছে এসে পড়ছে। তখন তিনি খেলাধুলো ছেড়ে দিয়ে, বেহালা ফেলে দিয়ে, পড়ায় খুব মন দিলেন।

তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করলেন, বৃত্তি পেলেন। আগে যাঁরা ভয় পেয়ে-ছিলেন, তাঁরা এই খবর পেয়ে সুখী হলেন।

স্কুলে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে গগনচন্দ্র হোমের সঙ্গে তিনি বেশী মন খুলে কথা বলতেন। ধর্ম আর সমাজ নিয়েও দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হত।

গগনচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া আসা করতেন। তাঁদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক রতনমণি গুপ্ত মহাশয়ও ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি উপেন্দ্রকিশোরকে বড় স্নেহ করতেন। আমাদের দেশের কয়েকটি পুরনো সামাজিক প্রথায় ব্রাহ্মদের মন সায় দিত না, আর এদেশের প্রচলিত পূজাপদ্ধতিতেও তাঁদের মন সায় দিত না। তাঁদের ধারণা অনুসারে ধর্মের উন্নতির আর সমাজের সবরকম মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। শরীর মন বুদ্ধির সমস্ত শক্তি আর প্রাণের সমস্ত উৎসাহ নিয়ে তাঁরা এই কাজে নেমে পড়েছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে এটিক কথা আছে—'উত্তমা মানসী পূজা', অর্থাৎ মনে মনে ভগবানের পূজা করা সবচেয়ে ভাল। ব্রাহ্মেরা এটা বিশ্বাস করতেন। তাই উপাসনার জন্য প্রতিমা বা মূর্তি গড়াতেন না। তাঁরা জাতিভেদ স্বীকার করতেন না, আর মেয়েদেরও লেখাপড়া শেখাতেন। আজকাল প্রায় সকলেই মেয়েদের লেখাপড়া শেখায়, কিন্তু তখন অনেকেই এসব

পছন্দ করত না। এই সমস্ত কারণে ব্রাহ্মদের অনেক নিন্দা আর অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। তবু তাঁরা দমেন নি।

কয়েকজন ভাল ভাল ব্রাহ্মের সঙ্গে মিশে উপেন্দ্রকিশোরের মনও ব্রাহ্মসমাজের দিকে ঝুঁকেছিল। তাই দেখে হরিকিশোর রায়চৌধুরীর ভাবনা হল। হরিকিশোর প্রাচীন ধরনের নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। গগনচন্দ্র হোমের সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের মেশা তিনি পছন্দ করতেন না।

গগনচন্দ্র হোম

তাই তিনি তাঁর ছেলের উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন। উপেন্দ্রকিশোর কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে এমন একটা আলো দেখেছিলেন যার কথা তিনি ভুলতে পারলেন না। তিনি হরিকিশোরকে না জানিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে গগনচন্দ্রের সঙ্গে মিশতে লাগলেন।

কলেজে পড়বার জন্য উপেন্দ্রকিশোরকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানে একটা মেসে থেকে তিনি পড়াশোনা করতে লাগলেন। কলকাতায় তখন এত বাড়িঘর ছিল না, বিজলী বাতি ছিল না, ইলেকট্রিক ট্রাম, মোটরগাড়ি, সিনেমা, এসব ছিল না। রাস্তায় গ্যাসের বাতি আর বাড়িতে তেলের বাতি আর মোমবাতি জ্বলত। ভবানীপুর পল্লীগ্রামের মতো, আর টালিগঞ্জ জঙ্গলের মতন ছিল। তবে কলকাতা তখন ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। তাই শহরটার খুব নাম ছিল, আর শহরের যাতে উন্নতি হয় সে রকম চেষ্টা চলছিল। ধর্মের, সমাজ সংস্কারের, আর শিক্ষাবিস্তারের নানা আন্দোলনও এখানে চলছিল।

কলেজের ছাত্র উপেন্দ্রকিশোর পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে গান-বাজনার চর্চায় আগের চেয়ে গভীর ভাবে মন দিলেন। তাঁর চিন্তাশক্তি ক্রমেই বাড়ছিল, হৃদয়ের

ভাবগুলি আরো ভাল করে ফুটে উঠছিল, নিজেকে আর জগৎটাকে তিনি বেশী চিনছিলেন। ময়মনসিংহে থাকতেই তিনি গানের মধ্যে যে আনন্দের স্বাদ পেয়েছিলেন তার মধ্যে এখন তাঁর মন একেবারে তলিয়ে যেত। কথা দিয়ে সে আনন্দ একজন অন্যকে বোঝাতে পারে না ; যারা নিজেদের মধ্যে সেই আনন্দ বোধ করেছে শুধু তারাই বুঝতে পারে। পরে আরো বড় হয়ে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে নিজের অন্তরে ডুবে গিয়ে তিনি যে অমৃতের রস পেতেন, তাঁর কণ্ঠের সুরের মধ্যে দিয়ে সেই অমৃতের ধারা বাইরেও ঝরে পড়ত ; যারা শুনত তারাও সেই প্রাণ-ভোলানো আনন্দের ভাগ পেত।

কলেজে থাকতেই বেহালার দিকে তিনি আরও গভীরভাবে মনোযোগ দিলেন। অভ্যাসের ফলে তাঁর ক্রমেই বেশী সুন্দর করে বেহালা বাজাবার শক্তি বাড়তে লাগল। কিছুকালের মধ্যেই কেউ কেউ নিজেদের বেহালা নিয়ে তাঁর কাছে এসে বেহালা শিখতেন আর বাজাতেন। বাজাতে বাজাতে তিনি আনন্দে বিভোর হয়ে যেতেন, অন্যেরাও আনন্দে ভরপুর হয়ে যেত। উপেন্দ্রকিশোর নিজেই একটা খাতায় লিখে রেখেছিলেন যে এই সময়েই তিনি তাঁর ছবি আঁকার বিদ্যাকেও বাড়িয়ে তুলতে আর ছবি আঁকায় নিপুণ হয়ে উঠতে যত্নের সঙ্গে চেষ্টা করছিলেন। এই সব কাজে তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হত, কিন্তু এতে তাঁর কষ্টবোধ ছিল না। এগুলো ছিল তাঁর আনন্দের তপস্যা। ভবিষ্যতে তিনি একজন অতি বিখ্যাত চিত্রকর হয়েছিলেন।

তিনি একজন খুব বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন, কিন্তু সে কথা পরে বলা হবে।

কলকাতায় তিনি ব্রাহ্মসমাজের এমন কয়েকজন মহৎ লোকের দেখা পেলেন যাঁরা নানাভাবে দেশের উপকার করেছেন আর যাঁদের চরিত্রের তেজ, ধর্ম-বল আর ভাল ভাল কাজে উৎসাহ ছিল অতি অসাধারণ। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর যোগ বেড়ে গেল। তিনি খেয়ালের বশে ব্রাহ্মসমাজে যাননি ; তিনি বুঝেছিলেন যে সেখানে তিনি তাঁর প্রাণের শান্তির জিনিস পেয়েছেন।

ওদিকে ময়মনসিংহে হরিকিশোর রায়চৌধুরী হঠাৎ একদিন পরলোক গমন করলেন। শ্যামসুন্দর রায় আগেই দেহত্যাগ করেছিলেন।

উপেন্দ্রকিশোর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষা পাশ করেন। এখন সেটার নাম বিদ্যাসাগর কলেজ।

২২ বছর বয়সে উপেন্দ্রকিশোর প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির বড় মেয়ে বিধুমুখীকে বিয়ে করেন। দ্বারকানাথ অতি তেজস্বী, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়-

পরায়ণ মানুষ ছিলেন। তখন সাহেবদের চা বাগানে কুলিদের উপরে খুব অত্যাচার করা হত। কুলিদের ভুলিয়ে ভালিয়ে ধরে আনবার জন্য চা-বাগানওয়ালাদের একদল লোক ছিল, তাদের আড়কাঠি বলা হত। এইসব কথা শুনে দ্বারকানাথের খুব দুঃখ আর রাগ হল। তিনি আর ব্রাহ্মসমাজের একজন ধর্মপ্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন নিজেরা চা-বাগানে ছদ্মবেশে গিয়ে নানা বিপদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কুলিদের দুরবস্থা দেখলেন। ফিরে এসে তাঁরা খবরের কাগজে ঐসব কথা লিখতে লাগলেন, তাঁদের সঙ্গে গগনচন্দ্র হোমও লিখতে লাগলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টকে কুলিদের দুরবস্থার কথা জানিয়ে দিলেন। তখন আসামের চীফ কমিশনার স্যর হেনরি কটন চা-বাগানওয়ালাদের কুলি-ধরার আড়কাঠি দল ভেঙে দিলেন। দ্বারকানাথ আরো নানারকম সৎসাহসের কাজ করেছেন।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

উপেন্দ্রকিশোর কলকাতায় ১৩নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতে থেকে ছবি আঁকার কাজ আর ফটোগ্রাফির কাজ করে সংসার চালাতে লাগলেন। এই বাড়িতেই পরে পরে তাঁর বড় মেয়ে সুখলতা, বড় ছেলে সুকুমার, মেজো মেয়ে পুণ্যলতা, মেজো ছেলে সুবিনয় আর ছোট মেয়ে শান্তিলতা জন্মগ্রহণ করে। এদের ছেলেবেলা ঐ বাড়িতেই কাটে। এই সেকেলে বাড়িটা তাঁর ছেলে মেয়েদের কাছে একটা স্বপ্নপুরীর মত মনে হত। বাড়ির বাইরের অংশেই ছোটদের স্কুল ছিল। তারা ঐ স্কুলেই পড়ত। বাড়ির ভেতরের অংশের দোতলায় উপেন্দ্র-

কিশোর আর তাঁর পরিবারের সকলে থাকতেন। তেতলায় দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী তাঁর পরিবারের লোকদের নিয়ে থাকতেন। বাড়ির প্রকাণ্ড ছাতে বিকালে এই দুই পরিবারের ছেলেমেয়েরা হৈহৈ করে খেলা করত। একতলায় রান্নাবাড়ির উঠোনের অর্ধেকটা জুড়ে একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা ছিল।

ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

একটা ঘর ছেলেমেয়েদের কাছে বড় অদ্ভুত লাগত। সেটা ছিল তাদের ডাক্তার দিদিমা কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর (দ্বারকানাথের স্ত্রী) পড়বার ঘর। সেখানে দেয়ালে একটা মানুষের কঙ্কাল টাঙানো থাকত। বড় বড় আলমারিতে নানারকম ডাক্তারী বই আর নানারকম যন্ত্রপাতি থাকত। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী আর চন্দ্রমুখী বসু এ দেশের মেয়েদের মধ্যে প্রথম বি-এ পাস করেন, তাঁদের মধ্যে কাদম্বিনীই প্রথম ডাক্তারি পাস করেন আর বিলাত গিয়ে অস্ত্রচিকিৎসার উপাধি নিয়ে আসেন। বিয়ের আগে তাঁর নাম ছিল কাদম্বিনী বসু। চিকিৎসায় তাঁর খুব সুনাম হয়েছিল।

আর একটা ঘরে ঢুকতে ছেলেমেয়েদের একটু একটু গা ছমছম করত। সেটা ছিল উপেন্দ্রকিশোরের ফটোগ্রাফির 'ডার্করুম'—একটা অন্ধকার ঘর ; লাল কাচের ভেতর দিয়ে অস্পষ্ট আলো ঢুকে সেই ঘরের ফটোগ্রাফির নানারকম সরঞ্জামের উপরে অস্পষ্টভাবে পড়ে একটা রহস্যময় ভাবের সৃষ্টি করত।

উপেন্দ্রকিশোর বেহালা বাজাতেন, ছবি আঁকতেন, ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে শুনত আর দেখত।

তখন ছোটদের জন্য 'সখা ও সাথী' নামে বাংলা পত্রিকা ছিল। তিনি এই পত্রিকায় গল্প লিখতেন আর তাঁর বন্ধু প্রমদাচরণ সেন এই পত্রিকা চালাতেন।

তখন কলকাতায় প্লেগ হচ্ছিল বলে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে কিছু-কালের জন্য চুনারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁর ভাইয়েরাও গিয়েছিলেন, নরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীও। মস্ত দল হয়েছিল। তিনি চুনার দুর্গের একটা ছবি এঁকে রবীন্দ্রন থ ঠাকুরকে উপহার দিয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখেছেন যে তিনি রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের জমিদারির বাড়িতে এই ছবি দেখেছিলেন; উপেন্দ্রকিশোরের নাম লেখা ছিল। বাংলা ১৩০৭ সনের আষাঢ় মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকায় যতীন্দ্রনাথ বসু এই কথা লিখে গিয়েছেন।

চুনার ছাড়া গিরিডি, মধুপুর এইসব জায়গাতেও তিনি বাড়ির সকলকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন পর্যন্ত তাঁরা ১৩ নম্বরের বাড়িতেই ছিলেন, এই বাড়িতে আর একজন ছিলেন তিনি হচ্ছেন রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মেজ মেয়ে সুরমা। বিদ্যারত্ন মহাশয় পরে যখন সন্ন্যাসী হয়ে যান তখন তাঁর তিনটি ছোট ছোট মেয়েকে রেখে যান। তাদের মধ্যে সুরমাকে মানুষ করবার ভার নিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। তাঁর ছেলেমেয়েরা এই মেয়েটিকে সুরমা-মাসী বলত। শান্ত-বুদ্ধিমতী মানুষ, স্নেহ-ভরা মন। সুরমা মাসীর সঙ্গে পরে প্রমদারঞ্জন রায়ের বিয়ে হয়েছিল।

তখন বাংলা বইয়ে আর পত্রিকায় ভাল ছবি ছাপাবার ব্যবস্থা বা উপায় ছিল না। ছবিগুলো যাতে সুন্দরভাবে ছাপানো সম্ভব হয় তার জন্য উপেন্দ্রকিশোর বিলাত থেকে হাফটোন ছবি তৈরি করবার সব জিনিসপত্র আনালেন। এই সব জিনিস রাখবার জন্য আর হাফটোন ছবি ছাপাবার জন্য বেশী ঘরের দরকার হল। তখন বাড়ি বদলাবার দরকার হল।

তিনি সেই সব জিনিসপত্র আর পরিবারের সকলকে নিয়ে সেই বাড়ির অল্প দূরে ৭নং শিবনারায়ণ দাস লেনের বাড়িতে উঠে গেলেন। এই নতুন বাড়িতে তাঁর ছোট ছেলে সুবিমল রায়ের (লেখকের) জন্ম হয়। আমার ছেলেবেলার অল্প কয়েকবছর ঐ বাড়িতে কেটেছিল। এই বাড়িতে আমার খুড়তুতো ভাই করুণারঞ্জন রায়েরও (কুলদারঞ্জন রায়ের ছেলের) জন্ম হয়।

বাবা (উপেন্দ্রকিশোর) তখন কি ছবি আঁকতেন তা অত অল্প বয়সে আমি বুঝতাম না, কিন্তু ছবি আঁকার রঙগুলোর কথা আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে। লাল, নীল, হলদে, সবুজ নানারকম রঙ দেখে বড় খুশী হতাম। বাবার কাজের দুটো ঘরের কথা অস্পষ্ট মনে পড়ে—স্টুডিও আর ফটোগ্রাফির একটা অদ্ভুত

অন্ধকার ঘর ('ডার্করুম')। বাবা নানারকম বই পড়ে আর নিজের হাতে পরীক্ষা করে হাফটোন ছবির কাজ শিখে ফেললেন। ছবি ছাপাবার একটা প্রেসও একটা ঘরে ছিল, কিন্তু সেটার কথা আমার মনে বড়ই অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখানে থাকতে বাবা একবার সকলকে নিয়ে দেশে মসূয়াগ্রামে গিয়েছিলেন, কিন্তু সে কথা আমি ভুলে গিয়েছি। তবে শুনেছি যে বড়দের খুব ভাল লেগেছিল। দেশে কাকা নরেন্দ্রকিশোর আর অন্য অন্য আত্মীয়স্বজন খুব খুশী হয়েছিল।

অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এই নতুন বাড়িটাও ছেড়ে আমরা ২২নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে এলাম। এখন রাস্তাটার নাম কৈলাস বোস স্ট্রিট। এই বাড়িতে একদিন সকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাবার কাছে আসতে দেখলাম। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৪০।৪১ বছর হবে। বাবা তাঁকে আগে থেকেই চিনতেন। রবীন্দ্রনাথের তখন কালো চুল, কালো দাড়ি। তিনি বাবার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আর আমি অনেকদূরে দাঁড়িয়ে একটু দেখছিলাম। রবীন্দ্রনাথ বাবার বেহালা শুনতে বড় ভালবাসতেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান শুনে বাবা সেগুলোব স্বরলিপি লিখে নিয়েছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গানের সঙ্গে বাবা বেহালা বাজাতেন, তাই জোড়াসাঁকোর ঠাকুববাড়িব অনেকের সঙ্গেই তাঁব জানাশোনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বাবার লেখা গল্প আর বাবার আঁকা ছবিও খুব পছন্দ করতেন।

এই বাড়িতে আসার পর বাবার কাজ অনেক বেড়ে যায়। একে একে সব বলব।

বাবা গান গাইতেন, গান রচনা করতেন, গান শেখাতেন। দাদা-দিদিরা তো শিখতই, তাছাড়া কত চেনা-অচেনা লোক এসে শিখে যেতেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে যাঁদের খুব ভাল জ্ঞান ছিল তাঁরাও বাবার সঙ্গে গানের চর্চা করতেন আর তাঁর কথাগুলি খুব মূল্যবান মনে করতেন। তিনি ছোটদের জন্য অনেক গান লিখেছেন, আবার ব্রহ্মসঙ্গীতের তিন-চারটা গান রচনা করেছেন। তাঁর 'জাগো পুরবাসী' গানটা ব্রাহ্মসমাজে প্রত্যেকবছব ১১ই মাবের উৎসবে সকালে গাওয়া হত। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী এই গানটা বড় ভালবাসতেন। গানটা সকলেরই খুব প্রিয়। উৎসবের গানগুলো শিখে নিতে অনেকে বাবার কাছে আসত; বাড়িটা তখন গানে গানে গমগম করত।

বাবা 'হারমোনিয়ম শিক্ষা' আর 'বেহালা শিক্ষা' নামে ছুটো বই লিখেছিলেন। তবে তিনি বলতেন যে হারমোনিয়মের সুর আমাদের দেশের গানের সুরের সঙ্গে তত ভাল মেলে না। তিনি সেতার ও পাখোয়াজও বাজাতেন।

বাবা যখন সুন্দর সুন্দর জায়গায় বেড়াতে যেতেন, ছবি আঁকার জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতেন। দার্জিলিঙের পাহাড়, পুরীর সমুদ্র, গিরিডির শালবন, এইরকম কত ভাল ভাল দৃশ্যের অদ্ভুত সুন্দর সব ছবি তিনি এঁকে গিয়েছেন! ছেলেবেলায় বোধহয় ১৯০৪ সনে আমরা তাঁর সঙ্গে দার্জিলিং গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম যে বাবা ছবি আঁকতে আঁকতে মধ্যে মধ্যে পেছিয়ে এসে শান্তভাবে ছবিটার দোষ-গুণ দেখছেন, আবার এগিয়ে ছবির কাছে গিয়ে দরকার বুঝে কয়েকটা দাগ বা টান বা একটু তুলির কারুকার্য জুড়ে দিয়ে ছবিটাকে আরো সুন্দর করে তুলছেন। ছবির চেয়ে বাবার সেই চেহারাটাই বেশি মনে পড়ে। কী শান্ত, সজীব, আনন্দময় সে চেহারা! গিরিডিতে শালবনের দিকে তাকিয়ে তিনি যখন ছবি আঁকতেন তখন তাঁকে দেখে অনেকেব মনে হত যেন এ দেশের তপোবনের একজন মুনি।

ছোটদের জন্য যখন 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছোটদের মহাভারত' এইসব বই লিখতে আরম্ভ করলেন তখন প্রায় প্রতিদিন কিছু কিছু লিখে আমাদের পড়ে শোনাতেন। শুনতে আমাদের এত ভাল লাগত যে খেলাধুলোর কথা ভুলেই যেতাম। আমাদের মন তখন রামায়ণ মহাভাবতের যুগে চলে যেত। আমরা তাঁর সঙ্গে গিরিডি গেলাম, সেখানেও তিনি তাঁর লেখাগুলো আমাদের শোনাতেন। কাকা নরেন্দ্রকিশোরও সেবার তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিরিডি গিয়ে অন্য একটা বাড়িতে ছিলেন, আর আমার পিসেমশাই হেমেন্দ্রমোহন বসু (পারফিউমার এইচ বোস) আমার পিসতুতো ভাই-বোনদের নিয়ে গিরিডিতে অন্য একটা বাড়িতে উঠেছিলেন। আমরা এতজন ভাই-বোনে মিলে বাবাকে ঘিরে বসে তাঁর গল্পগুলো শুনতাম। সময়টা মহা আনন্দে কেটে যেত। এইভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি আরো কয়েকটা বই লিখেছিলেন—'টুনটুনির বই', 'মহাভারতের গল্প', আর কবিতায় 'ছোট্ট রামায়ণ'। বইয়ের ছবিগুলো তিনিই আঁকতেন। অন্য কয়েকজনের বইয়েতে ওতিনিই ছবি এঁকে দিয়েছেন। এর অনেক বছর আগে তিনি 'সেকালের কথা' বলে একটা বই লিখেছিলেন—প্রাচীন জীব-জন্তুর কথা।

এইখানে তাঁর কয়েকটি প্রসিদ্ধ আবিষ্কারের কথা বলা দরকার। তিনি খুব বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁর ঐ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো হচ্ছে হাফটোন আর লাইন ব্লক সম্পর্কে। আগে হাফটোন ব্লকের ছবি পরিষ্কারভাবে আর মোলায়েম করে ছাপাবার অনেক অসুবিধা ছিল। বাবা সেই অসুবিধা দূর করবার উপায় আবিষ্কার করেন, তার ফলে হাফটোন ছবি আগের চেয়ে সুন্দর আর মসৃণভাবে ছাপানো সম্ভব হয়েছে। তিনি 'স্ক্রীন-এ্যাডজাস্টার' আবিষ্কার করেন, যার ফলে

ক্যামেরার স্ক্রীনকে যান্ত্রিক উপায়ে ক্যামেরার ঠিক জায়গায় ঠিকভাবে রাখা অনেক সহজ হয়েছে। এক রঙের আর নানা রঙের ছবি ছাপানোর অনেক উন্নতি হয়েছে। ইউরোপে তাঁর আবিষ্কারগুলোর খুব সুখ্যাতি হয়েছিল। বাবার অনুমতি নিয়ে পেনরোজ কোম্পানি ঐ আবিষ্কারগুলোর পেটেন্ট নিয়ে তৈরি করতে আর বিক্রী করতে আরম্ভ করেন। পেনরোজ অ্যানুয়েল পত্রিকায় বাবার আবিষ্কার-গুলোর বিবরণ ছাপা হয়ে বের হয়েছিল। তিনি 'ডুয়োটাইপ' আর 'রে টিন্ট' প্রণালীও উদ্ভাবন করেন।

এইসব করতে বাবাকে অনেক পরিশ্রম আর অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছিল। তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মা (বিধুমুখী) বাবার স্বাস্থ্যের দিকে খুব দৃষ্টি নিতেন আর বাবার খুব যত্ন নিতেন। তাই বাবার পক্ষে দীর্ঘকাল এত পরিশ্রম করা সম্ভব হয়েছিল। মা বাড়ির সকলের আর আত্মীয়-স্বজনদের সেবা-যত্ন তো করতেনই, তাছাড়া অনাত্মীয় অনেকেই মায়ের কাছে প্রচুর স্নেহযত্ন আর সাহায্য পেয়েছেন। মা খুব ভাল রান্না করতে পারতেন। একবার তাঁর খুব অসুখ হয়। ডাক্তার তাঁকে অনেকদিন পর্যন্ত কাঁচকলার ঝোল খেতে বলেছিলেন। মা সেরে উঠে ডাক্তারকে নেমন্তন্ন খাওয়াতে চাইলেন আর ডাক্তার কী খেতে চান তা জিজ্ঞাসা করলেন। ডাক্তার মজা করে বললেন, 'কী আর খাব! কাঁচকলা রেঁধে দেবেন, তাই খাব।' নেমন্তন্ন খেতে এসে ডাক্তার দেখলেন যে মা সত্যিই কাঁচ-কলার নানারকম জিনিস রেঁধেছেন—শুক্তানি, তরকারি, বড়া, চপ, কোপ্তা, চাটনি, মিষ্টি—সব কাঁচকলার! ডাক্তার খুব তৃপ্তি করে খেয়ে বললেন, 'কাঁচকলা দিয়ে যে এত সব ভাল খাবার জিনিস করা যেতে পারে তা আমি আগে জানতাম না!'

সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ির একতলাটার সামনের (উত্তরের) অংশে আফিস, প্রেস, ছবি বানাবার নানারকম ওষুধ বা রাসায়নিক জিনিস, এই সব ছিল। এক তলার মাঝখানে একটা উঠোন ছিল; তার পশ্চিম ধারে ফটোগ্রাফির একটা ডার্করুম আর উপরে যাবার সিঁড়ি। পেছনের (দক্ষিণের) অংশে খাবার ঘর, চাকরদের থাকবার ঘর, রান্নাঘর, উঠোন, স্নানের ঘর, এই সব ছিল; দোতলায় উঠবার একটা ঘোরানো-ঘোরানো লোহার সিঁড়িও ছিল। দোতলায় সকলে থাকতাম। সামনের দুটো ঘরের দেওয়ালে বাবা অনেকটা ফুল-পাতা-লতার মতন নানারকম চিত্র এঁকে ঘর দুটোকে বড় সুন্দর করে দিয়েছিলেন। দোতলায় পিছনের পশ্চিম ধারে একটা ছোট ছাত ছিল। তেতলার ছাতের মাঝখানে

একটা ঘর ছিল। ছাতের উত্তর ভাগে কাঁচের ছাতওয়ালা একটা সুন্দর স্টুডিও ছিল। বেশি মেঘলা দিনে আর রাত্রে ছবির কাজ চালাবার জন্য বড় বড় আর্কল্যাম্প আনা হয়েছিল। খুব উৎসাহে কাজ চলতে লাগল।

ব্রাহ্মসমাজে ছোটদের উৎসবে বাবা সুন্দর সুন্দর গল্প বলতেন। একবার এই গল্পটা বলেছিলেন—'একজন লোক দোকানে খাবার কিনে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ ঠোঙার ভেতরের খাবারগুলোর মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। সিঙারা পান্তুয়াকে বলল, 'হ্যাঁরে, তুই আমার গায়ে সিকনি লাগিয়ে দিচ্ছিস কেন? তুই তো বড় খারাপ লোক!' শুনে পান্তুয়া বলল, 'ভাল রে ভাল! আমি তোর গায়ে মিষ্টি রস লাগিয়ে দিচ্ছি আর তুই বলছিস আমি সিকনি লাগিয়ে দিচ্ছি। তুই কেমন লোক?' তখন সিঙারা কচুরির কাছে নালিশ করল। কচুরি বলল, 'তাই তো, ওটা আমার গায়েও একটু একটু সিকনি লাগিয়ে দিয়েছে দেখছি। ওটার স্বভাব তো বড় বিচ্ছিরি।' ঠোঙার মধ্যে খুব ঝগড়া চলতে লাগল। একটু পরেই লোকটি বাড়ি পৌঁছিয়ে ঠোঙা থেকে খাবারগুলো তুলে নিয়ে খেতে বসল। তখন খাবার-গুলো 'হায় হায়' করে বলল, 'আমরা শুধু শুধুই ঝগড়া করলাম, এতে আমাদের কিছুই লাভ হল না।' লোকটিও দেখতে দেখতে ওদের খেয়ে শেষ করে ফেলল।'

বাড়িতে বাবা খুব সহজ ভাষায় সুন্দর করে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের কথা আর বিজ্ঞানের নানা কথা ছোটদের বুঝিয়ে দিতেন। দূরবীণ দিয়ে ধূমকেতু, চাঁদের পাহাড়, এইসব দেখিয়ে দিতেন। ছেলেমেয়েদের মধ্যে যার যে যে গুণ বা শক্তি ছিল সেগুলোকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করতেন। একজিবিশন দেখতে গেলে দেখবার জিনিসগুলোর কথা ছেলেমেয়েদের এমন সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিতেন যে অচেনা লোকেরাও এসে পাশে দাঁড়িয়ে শুনে যেত।

জ্যাঠামশাই সারদারঞ্জন আর কাকা মুক্তিদারঞ্জন মেট্রোপলিটন কলেজে (এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজ) পড়াতেন, তাই তাঁরা আর তাঁদের ছেলেমেয়েরা প্রায়ই এ বাড়িতে আসতেন। পিসতুতো ভাইয়েরা দল বেঁধে প্রায়ই আসতেন—অনেকগুলি ভাই। মামা-মাসীরাও আসতেন। খুব গল্প আর খেলাধুলো হত। কাকা কুলদারঞ্জন আগে কাছেই একটা বাড়িতে থাকতেন। খুড়িমা মারা যাবার পর তিনি এ বাড়িতেই উঠে এলেন; সঙ্গে তাঁর ছেলেমেয়েরা—করুণারঞ্জন, মাধুরীলতা, ইলা। এরা আমাদের বাড়িতেই বড় হয়েছে। দাদামশাই দ্বারকানাথ অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছিলেন। ডাক্তার দিদিমা (কাদম্বিনী গাঙ্গুলী) মধ্যে মধ্যে তাঁর ব্রুহাম গাড়িতে চড়ে এ বাড়িতে আসতেন। ছোটকাকা

প্রমদারঞ্জন রায় যখন দূরদেশ থেকে আসতেন তখন সকলে তাঁর মুখে বন-জঙ্গলের গল্প শুনতে পেত। পিসেমশাই হেমেন্দ্রমোহন বসু প্রথম ফনোগ্রাফ বা গ্রামোফোন কিনে সকলকে শোনালেন। নিজেই রেকর্ডও তুলতেন। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে তিনিই প্রথম মোটরকার কিনে সকলকে চড়ালেন। গুরুজনেরা যখন বসে বাবার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতেন আর হাসতেন, ছেলেমেয়েরা সেই দৃশ্য দেখে আনন্দ পেত। গগনচন্দ্র হোমকে আমরা দাদামশাই বলতাম। তাঁরাও আসতেন; দুই পরিবারে খুব ভাব।

সুকুমার রায় তখন একে একে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' প্রভৃতি নাটক লিখছিলেন। আব বাড়িতেই সেগুলো অভিনয় করা হত। অভিনয় অভ্যাসের মধ্যে বাবা মধ্যে মধ্যে সেখানে এসে একটু দেখে যেতেন, এতে সকলে উৎসাহ পেত। পরে অভিনয় দেখে আত্মীয়স্বজনরাও খুব আনন্দ পেত, বাবাও খুব খুশি হতেন।

এই বাড়িতেই বাবার কাজের বা ব্যবসার প্রতিষ্ঠানটির নাম হল 'ইউ রায় এণ্ড সন্স'। এখানেই তিনি ১৯১৩ সনে (বাংলা ১৩২০) 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করলেন। ভাল ভাল গল্পেব সঙ্গে ছেলেমেয়েরা তাদের পত্রিকায় এই প্রথম খুব ভাল ভাল ছবি দেখতে পেল। সন্দেশ পত্রিকা ছোট-বড় সকলেরই খুব প্রিয় হয়ে উঠল। এই পত্রিকায় বাবার লেখা খুব ভাল ভাল গল্প আর তাঁর আঁকা খুব ভাল ভাল ছবি তো থাকতই, তাছাড়া অনেক নামজাদা লেখকও এতে লিখতেন। ডাক্তার-দিদিমার ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এতে পোকামাকড়ের আর জীব-জন্তুর কথা লিখতেন। এই বিষয়ে তাঁর খুব জ্ঞান ছিল। তাঁর লেখাগুলোও বড় চমৎকার হত।

রামকুমার বিদ্যাবত্ন মহাশয়েব মেজো মেয়ে আমাদের বাড়িতেই বড় হয়েছিলেন আব আমরা তাঁকে সুরমামাসী বলতাম সে কথা আগেই লেখা হয়েছে। এই বাড়িটায় থাকতেই প্রমদারঞ্জন রায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের বড ছেলে প্রভাতরঞ্জনের আর বড় মেয়ে সুলেখার জন্ম এই বাড়িতেই হয়। এই বাড়িতে আমরা ১৯১৪ সনের শেষ পর্যন্ত ছিলাম। এখানে থাকতেই দিদিদের বিয়ে হয়েছিল—সুখলতার সঙ্গে ডাক্তার জয়ন্ত রাওএর, পুণ্যলতার সঙ্গে অরুণনাথ চক্রবর্তীর আর শান্তিলতার সঙ্গে প্রভাতচন্দ্র চৌধুরীর। বড়দাদা সুকুমার রায়েরও বিয়ে এখানে থাকতেই হয়। তাঁর স্ত্রী সুপ্রভা রায় খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। তিনি যাতে আরো ভাল করে গান শিখতে পারেন বাবা তার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সুখলতা রাও আর সুকুমার রায়ের অনেক লেখা আর বই তোমরা পড়েছ। পুণ্যলতা চক্রবর্তীর বই 'ছেলেবেলার দিনগুলি' তোমরা খুব সম্ভব

পড়েছ। শান্তিলতা চৌধুরীর লেখা 'পাকা রাঁধুনি' কবিতাটা 'সন্দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

১৯১১ সালের গ্রীষ্মকালে আমরা অনেকে বাবার সঙ্গে ময়মনসিংহে যাই। এই তাঁর শেষবারের মতন দেশে যাওয়া। কাকা নরেন্দ্রকিশোর আর দেশের আত্মীয়-স্বজন বড় সুখী হয়েছিলেন। জ্যাঠতুতো আর খুড়তুতো ভাইয়েরাও অনেকে গিয়েছিল।

১৯১৪ সনে বাবা শেষবারের মতন দার্জিলিং যান। আমরা 'নর্থভিউ' নামে বাড়িটায় ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার আর তাঁর স্ত্রী হেমলতা সরকারের কাছে উঠেছিলাম। আমরা তাঁকে হেম-মাসী বলতাম; তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা ছিলেন। বাবার সঙ্গে সেবার শুধু আমার মা, আমার ছোট দিদি শান্তিলতা আর আমি গিয়েছিলাম।

বাবা অতি খাঁটি মানুষ ছিলেন। অল্প সময়ের পরিচয়ের মধ্যেই সকলে বুঝতে পারত যে তাঁর মনটা খুব উঁচু। অনেক বিদেশী লোকও তাঁর সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর টাকাব লোভ বা যশের লোভ একেবারেই ছিল না। বিপদে শান্ত থাকতেন।

অসুখ করলে, রোগীর যা যা নিয়ম পালন করা উচিৎ তার সবগুলিই বাবা পালন করে চলতেন। বাবার একবার খুব কঠিন অসুখ করেছিল। ডাক্তার নীলরতন সরকার তাঁকে সারিয়ে দেন। সেরে ওঠার পরে বাবা ট্রেনে উঠে একটা ভাল জায়গায় যাচ্ছিলেন। পথে ডাক্তার নীলরতন সরকার ট্রেনে উঠে বাবার কাছে বসে একটা পাত্র থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রসগোল্লা বের করে একটা প্লেটে রাখলেন। পরে বাবাকে বললেন, 'দীঘাপাতিয়ার মহারাজার বাড়িতে চিকিৎসা করতে গিয়েছিলাম, সেখানেই রসগোল্লাগুলো পেয়েছি। আপনি খাবেন?' বাবা বললেন, 'আমার খাওয়া উচিত কি অনুচিত তা আপনিই বেশী জানেন।' ডাক্তার সরকার বললেন 'খেয়ে দেখুন; কিছু হবে না।' বাবা তখন রসগোল্লা খেলেন। তাঁর কিছু ক্ষতি হল না।

১৯১৪ সন শেষ হতেই আমরা ১০০ নং গড়পার রোডে আমাদের নতুন বাড়িতে উঠে গেলাম। এই বাড়িটা বাবা নিজের আঁকা নকশা আর নিজের পরিকল্পনা অনুসারেই তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। একতলায় সামনের (উত্তরের) ঘরগুলোতে অফিস আর ছাপাখানা ছিল। পেছনের (দক্ষিণের) অংশে খাবার ঘর, স্নানের ঘর, রান্নাঘর, এইসব ছিল। দোতলায় সামনের অংশে হলের মতন

(hall) লম্বা ঘরে ফটোগ্রাফির আর ব্যবসার অন্য কতকগুলো কাজ হত। নীচে ছাপাখানা ঘরটাও হলের মতন লম্বা ছিল। দোতলায় পেছনের দিকে থাকবার ঘর আর স্নানের ঘর। তেতলায় ছাত আর ঘর। বাড়ির দক্ষিণে অনেকখানি জমি ছিল।

গড়পার রোডের বাড়িতে আসার পরেই মেজো দাদা সুবিনয় রায়ের বিয়ে হল। বাবার সঙ্গে আমরা কয়েকজন মিলে মধ্যপ্রদেশের 'চাঁদা' শহরে গেলাম। সেখানে ডাক্তার লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর মেয়ে পুষ্পলতার সঙ্গে সুবিনয়ের বিয়ে হল। নতুন বউদিদিকে নিয়ে আমরা কলকাতায় গড়পারের বাড়িতে ফিরে এলাম। সুবিনয় রায়ের লেখা তিনটা বইয়ের কথা তোমরা হয়তো জান—'খেয়াল', 'রকমারি', 'তাড়াতাড়ি'।

দাদারা বাবাকে কারবার চালাতে খুব সাহায্য করতেন। বড়দাদা সুকুমার রায় বিজ্ঞানের খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। তাই বাবা তাঁকে বিলাতে পাঠিয়ে ভাল করে কাজ শিখিয়ে এনেছিলেন। মেজোদাদা সুবিনয় বাড়িতেই কাজ শিখে নিয়েছিলেন।

১৯১৫ সনে বাবা শেষবারের মতন গিরিডি গেলেন। ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের গিরিডির বাড়িতে তিনি উঠেছিলেন। কলেজে পুজোর ছুটি আরম্ভ হলে আমি গিরিডি গেলাম। একদিন সকালে আমি বেড়িয়ে এসে বেলা ১০টা-১১টায় বাড়ির বাগানের দরজায় ঢুকেই দেখি একজন ডাক্তার এসেছেন। শুনলাম বাবার খুব অসুখ। ডাক্তারের ওষুধ চলতে লাগল। আমার জ্যাঠামশাই সারদারঞ্জন রায় তখন গিরিডিতে ছিলেন। তিনিও এসে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিতেন; কিছুদিন পরে একটু উপকার দেখা গেল।

কলেজ খুললে আমি কলকাতায় চলে এলাম। বাবার অসুখ কিছুতেই সারছিল না, তাই তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল। বড় বড় ডাক্তারেরা দেখলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কঠিন অসুখের মধ্যেও বাবা খুব শান্ত থাকতেন; বলতেন, 'আমি খুব আনন্দে আছি।' একদিন বললেন, 'তোমরা আমাকে যে-সব ওষুধ আর পথ্য দিয়েছ, আমি সেগুলো অমৃত জ্ঞানে খেয়েছি।' একদিন সকালে কতকগুলো পাখি জানালার কাছে কিচিরমিচির করে গেল। বাবা বললেন, 'পাখি কী বলল, তোমরা শুনেছ? পাখি বলল, 'পথ পা, পথ পা।' ১৯১৫ সনের বিশে ডিসেম্বর (বাংলা ১৩২২ সনের চৌঠা পৌষ) সকালে তিনি গভীর শান্তিতে পরলোকগমন করলেন।

ছোট ছোট ঘটনা

সারদারঞ্জন রায়ের কথা

বিদ্যাসাগব কলেজেব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় সাবদাবঞ্জন রায় গম্ভীর স্বভাবের মানুষ ছিলেন। একদিন তিনি কলকাতাব ময়দানে (গড়েব মাঠে) ট্রামে বেড়িয়ে খুব হাসিমুখে বাড়িতে ফিবলেন আব মধ্যে মধ্যে হাসতে লাগলেন। হাসির কারণও তাঁব কাছে শোনা গেল। তাঁব ট্রাম এক জায়গায় অল্পক্ষণের জন্য থেমে ছিল। তখন একজন পাঁউরুটি-বিস্কুটওয়ালা 'পাঁউরুটি-বিস্কুট', 'পাঁউরুটি-বিস্কুট' বলতে বলতে ট্রামেব দিকে এগিয়ে আসছিল। হঠাৎ লোকটি 'পাঁউরুটি বি—এহে—হে হে হে হে' বলে নীরব হয়ে গেল। সাবদারঞ্জন চমকিয়ে উঠে তাকিয়ে দেখলেন, লোকটির পা গোববে হড়কিয়ে গিয়েছে আর পায়ে গোবর মাখামাখি হয়ে গিয়েছে। সে অবাক হয়ে নিজের পায়ের অবস্থা দেখছে। লোকটি 'বিস্কুট' বলতে গিয়ে 'বি' উচ্চারণ করা মাত্রই গোবরে পা পিছলিয়ে গিয়েছিল, তাই 'এহে-হে হে হে হে' বলে উঠেছিল।

সারদারঞ্জন মধ্যে মধ্যে স্বপ্নে ভবিষ্যতের ঘটনা দেখতে পেতেন। তিনি কিশোরগঞ্জ মাইনর স্কুল থেকে পাস করে বেরিয়ে ময়মনসিংহ শহরে জেলা স্কুলে পড়াশোনা করতে থাকেন। তখন তাঁর খুব হজমের গোলমাল হয় আর স্বাস্থ্য খুব

খারাপ হয়। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। শরীর খারাপ হওয়াতে তিনি ইংরাজী বই ভাল করে পড়তে পারেননি। টেস্ট পরীক্ষায় ইংরাজীতে তিনি খুব কম নম্বর পেলেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাঁকে বললেন, 'সারদা, তুমি এ বছর পরীক্ষা দিও না। পরের বছর পরীক্ষা দিলে খুব ভাল নম্বর পাবে।' অন্যান্য শিক্ষক মহাশয়গণ প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে অনুরোধ করাতে তিনি সারদারঞ্জনকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার অনুমতি দিয়ে তাঁর নাম পাঠিয়ে দিলেন। পরীক্ষা দেবার জন্য সারদারঞ্জন ঢাকায় এলেন। স্বাস্থ্য খারাপ থাকাতে তখন পর্যন্ত ইংরাজী বই ভাল করে পড়া হয়নি। পরীক্ষার আগের রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন যেন তিনি পরীক্ষার ঘরে গিয়েছেন; সেখানে কোথায় তাঁকে বসতে হবে তাও দেখতে পেলেন। স্বপ্নেই দেখলেন তাঁর বসবার জায়গার কাছে একটা লাল থান ইট পড়ে আছে, আর একজন লম্বা রাশভারী চেহারার লোক সেই ঘরে উপস্থিত। ঘণ্টা পড়লে প্রশ্নপত্র বিলি করা হল; সারদারঞ্জন প্রশ্নগুলি দেখতে পেলেন। এর পরেই তাঁর স্বপ্ন ভেঙে গেল। ভাগ্যের উপর নির্ভর করে সারদারঞ্জন সেই প্রশ্নগুলির সঙ্গে মিলিয়ে ইংরাজী বই পড়ে রাখলেন। পরের দিন পরীক্ষা দিতে গিয়ে তিনি দেখলেন, স্বপ্নে যা যা দেখেছিলেন তার সবকিছুই ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে—স্বপ্নে দেখা জায়গাতেই তাঁর বসবার জায়গা, কাছেই সেই প্রকাণ্ড লাল ইট পড়ে আছে, সেই লম্বা রাশভারী মানুষটিও উপস্থিত। প্রশ্নপত্র এলে দেখা গেল, স্বপ্নদৃষ্ট প্রশ্নগুলিই এসেছে। সারদারঞ্জন ভালভাবেই পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তি পেলেন।

ছোট ছোট ঘটনা

সারদারঞ্জন বৃদ্ধ বয়সেও সকালে গঙ্গাস্নানের জন্য ইডেন গার্ডেনের পাশ দিয়ে ছুটে গড়ের মাঠে আসতেন। একদিন একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ তাঁকে ঐভাবে ছুটে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাশয়, আপনার বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?' সারদারঞ্জন বললেন, 'আন্দাজ করুন তো।' সাহেব বললেন, 'পঁয়তাল্লিশ'? সারদারঞ্জন বললেন, 'আরো বেশী'। সাহেব তখন বললেন, 'পঞ্চাশ'? সারদারঞ্জন বললেন, 'আরো বেশী'। সাহেব চমকিয়ে গিয়ে বললেন, 'ষাট'? উত্তর পেলেন, 'তার চেয়েও বেশী'। এবারে সাহেব একেবারে অবাক হ'য়ে গেলেন। তখন সারদারঞ্জন নিজেই বললেন, 'চৌষট্টি'। সাহেব বললেন, 'আপনাকে দেখে আমার বড় আনন্দ হল। এই বয়সের মানুষকে আমি এত তাড়াতাড়ি ছুটতে আগে কখনও দেখিনি, কোন বৃদ্ধ বাঙালীর এমন সুস্থ সবল শরীর আগে দেখিনি।'

শিবনাথের কবিতা

ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ নেতা স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মপ্রচারের আর শিক্ষাবিস্তারের জন্য কঠিন পরিশ্রম করে গিয়েছেন। তিনি বড়দের জন্য অনেক বই লিখেছেন, ছোটদের জন্য গল্প লিখেছেন, তিনি ভাল কবিতা রচনা করতে পারতেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি কবিতা লিখতে পারতেন।

ছেলেবেলায় একদিন শিবনাথ তাঁর বাবা হরানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে তাঁদের গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। অন্যদিক থেকে সেই গ্রামের 'ভজ' নামে একটি লোক আসছিল। লোকটির মাথায় ঝুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, গলায় তুলসীর মালা, পেটে গুলের দাগ, উপরের ঠোঁট একটু ফাঁক বা কাটা (যাকে সাধারণত গন্ধথাঁদা বা গন্ধকাটা বলে)। শিবনাথকে বাবা বললেন, 'ঐ দেখ ভজ আসছে, ওর নামে একটা কবিতা বানা।' শিবনাথ তখন আট বছরের বালক। শিবনাথ তখনই কবিতা বানালেন—

শিরে শোভিছে শাক,
মুখমণ্ডল ফাঁক,

গলে কাষ্ঠমালা,
পেটে দাগ মেলা,
নহে বস্ত্র সাদা,
ভজ, গন্ধখাঁদা।

বালক শিবনাথ 'ভজ গন্ধ খাঁদা ভজ গন্ধ খাঁদা' বলতে বলতে আনন্দে অস্থির হয়ে পড়লেন।

সিটি কলেজ স্কুলের প্রাচীন শিক্ষক স্বর্গীয় সারদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী মহাশয় এই ঘটনার কথা বলতেন। তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের চটি

কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজকে অনেক বছর আগে মেট্রোপলিটন কলেজ বলা হত। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বেঁচে থাকতে একবার ঐ কলেজের দুই দল ছাত্রের মধ্যে ঝগড়া হয়। একদল ছাত্র অন্যদলের পেছনে গুণ্ডা লাগিয়ে দেয়। বিদ্যাসাগরমশাই সেদিন অসুস্থ ছিলেন, তাই কলেজে আসেননি। ছুটির পরে অনেক ছাত্র গুণ্ডার ভয়ে বাড়ি ফিরতে পারছিল না; কলেজেই আটকা ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়িতে একজন লোক গিয়ে এই খবরটা তাঁকে জানিয়ে দিল। বিদ্যাসাগর একটা পালকিতে উঠে কলেজে এসে নামলেন আর সামনেই যে গুণ্ডাকে দেখতে পেলেন তার দিকে এগিয়ে গেলেন। নিজের পা থেকে চটি খুলে তিনি সেই গুণ্ডাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'আমার কলেজের ছেলেদের মারবি?' গুণ্ডা ফিরে দেখে, বিদ্যাসাগরমশাই শূন্যে চটি তুলে তার দিকে তেজের সঙ্গে তাকিয়ে আছেন। এই দেখামাত্রই সে বিদ্যাসাগরের পায়ে ঢিপ করে এক প্রণাম করে সেখান থেকে সরে পড়ল, তার দলের দুষ্টু লোকেরাও সরে পড়ল। ছাত্রেরা তখন নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের বাড়িতে ফিরে গেল।

বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় সারদারঞ্জন রায় মহাশয় এই ঘটনার কথা জানতেন।

গেছো ভয়

স্বর্গীয় নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়কে আমরা 'দাদামশাই' বলে ডাকতাম। জানা-শোনা সকলেই এঁকে গুরুজনের মতন আর বন্ধুর মতন দেখতেন। ব্রাহ্মসমাজের কাজে ইনি গ্রামে গ্রামে আর শহরে শহরে অনেক ঘুরেছেন। ইনি কলকাতায় এলে আমরা এঁর কাছে অনেক ভাল ভাল গল্প শুনতাম আর ভাল ভাল উপদেশ পেতাম। এঁর কাছে শোনা একটা ঘটনার কথা তোমাদের বলছি।

নবদ্বীপ দাদামশাই খুব সাহসী লোক ছিলেন। ছেলেবেলায় একবার একটা গাছে আলেয়া দেখে ভয় পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু কিছু বড় হওয়ার পরে তাঁর সব ভয় দূর হয়ে যায়। তিনি একদিন বিকালে তাঁর এক কাকার সঙ্গে এক গ্রাম থেকে অন্য এক গ্রামে হেঁটে যাচ্ছিলেন। পাড়াগেঁয়ে রাস্তা, মধ্যে মধ্যে ধানক্ষেত, কাছে লোকালয় নেই। যেতে যেতে হঠাৎ তাঁর কাকা বললেন, 'নবদ্বীপ! সামনে দূরে একটা শেয়াল কী রকম চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাচ্ছ?' দাদামশাই দেখে বললেন, 'হ্যাঁ, দূরে ধানক্ষেতের ওপারে একটা শেয়াল রয়েছে বটে।' তাঁর কাকা বললেন, 'শেয়ালটাকে কেমন একটু অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। ঐ ভাবে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন?' দাদামশাই বললেন, 'তা তো জানি না, তবে শেয়াল আমাদের কিছু করতে পারবে না।' তাঁরা আবার হেঁটে চললেন আর নিজেদের মধ্যে গল্প করতে লাগলেন। তাঁর কাকা হঠাৎ আবার থমকিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নবদ্বীপ! আগে যেখানে শেয়াল ছিল, এখন সেখানে একটা শুয়োর এসে কেমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাচ্ছ?' দাদামশাই বললেন, 'ধানক্ষেতে শুয়োর মধ্যে মধ্যে আসে, আপনি এত ভাবছেন কেন?' তাঁরা আবার চলতে লাগলেন, কিন্তু তাঁব কাকার মনে একটা খটকা লেগে গেল। এদিকে অল্প অল্প সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কিছু পরে তাঁর কাকা আবার বললেন, 'নবদ্বীপ! সেই শুয়োরটার জায়গায় এখন একটা মহিষ এসে গিয়েছে, দেখতে পাচ্ছ?' দাদামশাই দেখলেন যে ধানক্ষেতের ওপরে সত্যিই একটা মহিষ দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যার ঘোলাটে আলোয় মহিষটাকে কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছিল। দাদামশাই বললেন, 'তাই তো! সত্যিই তো মহিষ। আমরা একটু সাবধানে চলব, তবে মহিষটার কিছু খারাপ মতলব আছে বলে মনে হচ্ছে না।' তাঁর কাকা কিন্তু বেশ ঘাবড়িয়ে গিয়েছেন; মহিষটার চেহারাও একটু অদ্ভুত ছিল। তাঁরা এগিয়ে যেতে লাগলেন। কিছুদূর যেতেই তাঁর কাকা

বললেন, 'দেখো দেখো, এবার এখানে একটা হাতি এসেছে! ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত নয়?' দাদামশাই বললেন, 'ঠিক বলেছেন তো! হাতির কাছে না যাওয়াই ভাল। রাস্তাটা হাতির পাশ দিয়েই গিয়েছে; আমরা পথ থেকে নেমে একটু বেঁকে যাব।' তাঁর কাকাকে তিনি নানাভাবে সাহস দিলেন। এগোতে এগোতে তাঁরা দেখলেন যে, সেখানে হাতি বা মহিষ কিছুই নেই; খানিকটা ঝোপঝাড়ের উপরে একটা গাছ নুয়ে পড়েছে, আর গাছের দুটো ডাল খোঁচা খোঁচা হয়ে উপর দিকে নুয়ে পড়েছে। তাই দেখেই দূর থেকে অল্প আলোতে তাঁরা শেয়াল শুয়োর মহিষ আর হাতি বলে ভুল করেছিলেন। যতই এগোচ্ছিলেন, সেটাকে ততই বড় দেখাচ্ছিল।

বাঘের থাবা

শ্যামাকান্তবাবু (শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়) শুধু হাতে বড় বড় বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে সেই বাঘকে পোষ মানাতেন; অস্ত্র ব্যবহার করতেন না। কয়েকটা বাঘকে তিনি এইভাবে পোষ মানিয়েছিলেন। তিনি সার্কাস খুলে বাঘের খেলা দেখাতেন। একবার একজন রাজা তাঁকে বলেন, 'আপনি বোধহয় পোষা বাঘ কিনে খেলা দেখান; আপনি যে জংলী বাঘকে বশ করতে জানেন তার প্রমাণ কী? আমার লোকেরা একটা জংলী বাঘ ধরেছে। আপনি কি সেটার সঙ্গে লড়াই করতে পারেন?' শ্যামাকান্তবাবু বললেন, 'পারি। আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।' তাঁকে বাঘের খাঁচার ধারে নিয়ে যাওয়া হল। অনেক লোক খেলা দেখতে এসেছে। শ্যামাকান্তবাবু যখন বাঘের সঙ্গে লড়াই করতেন তখন সাহস করে বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে, সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তিনি বলতেন, 'বাঘের গায়ে মানুষের চেয়ে জোর বেশি বটে, কি মানুষের মনের জোর বেশি। বাঘের চোখের দিকে সাহসের সঙ্গে তাকি থাকলে বাঘের ধাঁধাঁ লেগে যায়।' তিনি বাঘের খাঁচায় ঢুকে তার চোখের দি তাকিয়ে থেকে শুধু হাতে লড়াই করে যেতে লাগলেন। শ্যামাকান্তবাবুর যেম জোর তেমনি সাহস ছিল। জংলী বাঘটা শেষে হেরে গিয়ে যুদ্ধ ছাড়ল। লোকে

খুব খুশী হলেন। শ্যামাকান্তবাবু অনেক টাকা পেলেন, আর রাজা শ্যামাকান্ত-বাবুকে সেই বাঘটা উপহার দিলেন।

শ্যামাকান্তবাবু অনেক বছর ধরে বাঘের খেলা দেখিয়েছিলেন। একদিন তাঁর বাবা শশীবাবু তাঁকে বললেন, 'আমার মৃত্যুর পরে তুমি আর বাঘের খেলা দেখাবে না।' শশীবাবু 'ফকির সাহেব' নামে একজন খুব বৃদ্ধ সাধুর কাছে উপদেশ নিতেন। ফকির সাহেবও শ্যামাকান্তবাবুকে বলেছিলেন, 'শশী যখন পৃথিবীতে আর থাকবে না তখন তুমি বাঘের খেলা ছেড়ে দিও।' এর পরে ফকির সাহেব মুরাদনগরের কাছে রহিমপুরে দেহত্যাগ করেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে কুমিল্লায় শ্যামাকান্তবাবুর বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। শ্যামাকান্ত-বাবু খবর পেয়ে কুমিল্লায় তাঁর বাবার কাছে চলে এলেন। অনেক চিকিৎসার পরে শশীবাবুর অসুখ ভাল হয়ে গেল।

শশীবাবুকে সুস্থ হয়ে উঠতে দেখে শ্যামাকান্তবাবু আবার সার্কাস নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরতে লাগলেন। একদিন সন্ধ্যায় শ্যামাকান্তবাবুব বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। শ্যামাকান্তবাবু তখন অনেক দূরে একটা শহরে সার্কাস নিয়ে রয়েছেন। তাঁর বাবার মৃত্যুর কথা জানতে না পেরে তিনি সেই রাত্রেও খেলা দেখাতে বাঘের খাঁচায় ঢুকলেন। শ্যামাকান্তবাবুর এই একটা অভ্যাস ছিল যে বাঘ তাঁর দিকে লাফ দিতেই তিনি একটা হাত এগিয়ে দিয়ে বাঘটাকে আটকাতেন, আর নিজের মাথাটাকে পেছনের দিকে সরিয়ে নিতেন, যাতে বাঘটা মাথায় থাবা মারতে না পারে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাঘের নাকে মুখে কপালে খুব জোরে চটপট কয়েকটা ঘুষি বসিয়ে দিতেন। বাঘটা তাঁর হাতের উপর থেকে থাবা নামিয়ে আবার লাফ দিত। তিনিও আবার ঐভাবে বাঘটাকে জব্দ করতেন। সেদিন বাঘটা খুব রেগে ছিল আর শ্যামাকান্তবাবুও কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। বাঘটা বুঝতে পেরে সেই মুহূর্তেই তাঁর মাথায় এক থাবা মেরে তাঁর গালের আর গলার অনেকখানি মাংস খাবলিয়ে নিল। একজন সাহেব বাঘটাকে গুলি করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শ্যামাকান্তবাবু তাঁকে মানা করলেন। শ্যামাকান্তবাবুর কানের পাশ থেকে আরম্ভ করে কণ্ঠনালীর ধার পর্যন্ত মাংস উঠে গিয়েছিল, কণ্ঠনালী দেখা যাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেও তিনি খুব জোরে একটা ঝটকা মেরে বাঘটাকে দূরে ফেলে দিলেন। তাঁর প্রাণ বেঁচে গেল, কিন্তু তিনি অল্পকালের জন্য অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তাঁর জ্ঞান হতেই একজন লোক এসে তাঁকে খবর দিল যে তাঁর বাবা শশীবাবু আর বেঁচে নেই।

অনেক দিন বিশ্রাম নিয়ে শ্যামাকান্তবাবু সুস্থ হয়ে উঠলেন, কিন্তু বাঘের খেলা ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন।

একদিন হঠাৎ শুনতে পেলাম যে তিনি কলকাতায় এসেছেন আর আমাদের বাড়িতে তাঁকে নেমন্তন্ন খেতে বলা হয়েছে। আমি তখন খুব ছোট। সেইদিন সন্ধ্যায় তিনি আমাদের বাড়িতে এলেন। বাবা তাঁকে নিয়ে দোতলায় বসবার ঘরে বসালেন। আমরা সেই ঘরে গিয়ে দেখলাম যে শ্যামাকান্তবাবু সন্ন্যাসী হয়ে লম্বা চুল আর দাড়ি রেখেছেন। তিনি দাড়ি ফাঁক করে করে বাঘের আঁচরের দাগ দেখালেন। রাত্রে নেমন্তন্ন খেয়ে তিনি চলে গেলেন। এর পরে তিনি বেশীর ভাগ সময় হিমালয়ে নয়নীতালের কাছে ভাওয়ালির জঙ্গলে তাঁর আশ্রমে কাটাতেন। সন্ন্যাসী হওয়ার পরে তাঁর নাম হয় সোহহং স্বামী। তিব্বতীবাবা নামে একজন খুব প্রাচীন বাঙালী যোগী শ্যামাকান্তবাবুর 'সোহহং স্বামী' নামকরণ করেন। তিব্বতীবাবা বাঙালী হলেও অনেক বছর তিব্বতে ছিলেন বলে লোকে তাঁকে 'তিব্বতীবাবা' বলত। এঁকেও আমি দেখেছি।

সুকুমার রায়

সুকুমার রায় ছেলেবেলায় কলকাতায় সিটি কলেজ স্কুলে পড়তেন। অন্নদাচরণ সেন মহাশয় সেই স্কুলে ইংরাজি পড়াতেন। তিনি একদিন একটা ইংরাজি কবিতার মানে বোঝাতে বোঝাতে দেখতে পেলেন যে, তাঁর ছাত্র সুকুমার অন্য কথা ভাবছে। তিনি সুকুমারকে সেই কবিতার মানে বোঝাতে বললেন। বালক সুকুমার নিজের বুদ্ধিতে সেই কবিতার একটা নতুন রকমের মানে করে দিল। অন্নদাবাবু দেখলেন যে সুকুমারের উত্তরটা নতুন ধরনের হলেও সেটাকে ভুল বলা যায় না ; কবিতাটার দু-রকম অর্থই হতে পারে। অন্নদাবাবু বড় খুশী হলেন।

একবার সুকুমারদের ক্লাশে একজন নতুন শিক্ষক মহাশয় কিছুদিনের জন্য পড়াতে এলেন। তিনি যেমনি রাগী তেমনি কালো। তাঁর রাগের ঠেলায় স্কুলের ছেলেরা অস্থির হয়ে উঠল। একদিন সেই নতুন মাস্টারমশাই সাদা মোজা পায়ে দিয়ে স্কুলে এলেন। মিশমিশে কালো পায়ে ধবধবে সাদা মোজা মোটেই খাপ খাচ্ছিল না। তিনি ক্লাসে ঢুকতেই সুকুমার আর তার বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'ওই রে! মাস্টারমশাই আজ পায়ে চুনকাম করে এসেছেন।'

একজন ছাত্র জিজ্ঞাসাই করে ফেলল, 'স্যার, আপনি পায়ে চুনকাম করেছেন কেন ?' সেই রাগী শিক্ষকমহাশয় এই প্রশ্নের ভাল উত্তর দিতে পারলেন না। বোধহয় তাঁর রাগ হলেও ভিতরে ভিতরে হাসিও পাচ্ছিল।

সুকুমার খুব সাহসী ছিলেন। একবার ছেলেবেলায় তিনি তখনকার ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে তেতলার একটা ঘরে একা ঘুমোচ্ছিলেন। গভীর রাত্রে তিনি জেগে গিয়ে দেখলেন যেন বারান্দা থেকে একজন অচেনা বুড়ো মানুষ ঘরের জানলার গরাদে মুখ ঠেকিয়ে হাসছে। বুড়োর শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছিল। সুকুমার 'কে ? কে ?' বলে ডাক দিলেন, কিন্তু উত্তর পেলেন না। বুড়ো তখনও তেমনই অদ্ভুত ভাবে নিঃশব্দে হাসছে। সুকুমার তখন উঠে গিয়ে সেই বুড়োর মুখ ধরে নাড়া দিলেন আর বুঝতে পারলেন যে ওটা মানুষের মুখ নয়—গরাদের গায়ে একটা ছোট পুঁটলি আর গামছা বা ঝাড়ন বাঁধা রয়েছে। তখন সুকুমারের খুব মজা লাগল।

সুকুমার সকলকে নানাভাবে আনন্দ দিতে ভালবাসতেন। তিনি যখন কলেজে পড়েন তখন বাড়িতে (২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটে) 'ননসেন্স ক্লাব' বলে একটা ক্লাব খোলেন। এই সময়ে তিনি 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' প্রভৃতি নাটক রচনা করে বাড়িতেই আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সেগুলির অভিনয় করান। নাটক-গুলির গান তিনি নিজেই রচনা করেন, সুরও তিনিই দেন। সুগ্রীব আর রাবণের যুদ্ধে সুগ্রীবের হাতে একটা গ্রামাফোনের চোঙা থাকত—সেটাই তার অস্ত্র। লম্বা বালিশ দিয়ে রাবণের গদা হত। কাপড়ে ঠাসা একটা বোঁচকা দিয়ে গন্ধমাদন পর্বত হত। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকের অভিনয়ে এইগুলি ব্যবহার করা হত।

একবার সুকুমারের এক মামা (স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়) সুকুমারের একটি নাটকের অভিনয়ের মধ্যে ছিলেন। আমরা তাঁকে 'মংলুমামা' বলতাম। তাঁর আর সুকুমারের বয়স প্রায় সমানই ছিল।

একদিন মংলুমামা অভিনয় অভ্যাস করতে আমাদের বাড়িতে এলেন আর দুপুরে একটা মাদুরে শুয়ে বিশ্রাম নিতে নিতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে অভিনয়-অভ্যাসের সময় হয়ে আসছে। সুকুমার মংলুমামাকে কিন্তু তখনই জাগালেন না। তিনি মামার কাছায় একটা দড়ি বেঁধে, সেই দড়ির শেষে একটা ডাম্বেল বেঁধে দিলেন। মামার সামনে মুখের কাছেই একটা পিরিচে কিছু ঘাস রেখে দিলেন, আর পিরিচের ধারেই একটা আয়না রাখলেন। নিজেরা মামার

সামনে আর আশেপাশে গল্প আর চলাফেরা করতে লাগলেন। মংলুমামা জেগে গিয়ে প্রথমে নিজের মুখের কাছেই পিরিচে রাখা ঘাস দেখতে পেলেন আর আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখলেন—যেন ঘাস খেতে খেতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এই ভাবের চেহারা। মামা সামনে যাকে পেলেন তাকে তাড়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছার দড়িতে বাঁধা ডাম্বেলটা ঘট-ঘট-ঘট-ঘট শব্দে তাঁর পিছনে পিছনে চলল। তিনি তখনই পিছনের দিকে তাকিয়ে কাণ্ডখানা বুঝতে পারলেন। তখন সকলের আনন্দ দেখে কে! মামা থেমে গিয়ে স্থির হয়ে কাছার দড়িটা খুলে ফেললেন। আর আবার কাজের দিকে মন দিলেন।

১৯১১ সন আকাশে 'হ্যালির ধূমকেতু' নামে ধূমকেতু দেখা গেল। ধূমকেতুটা ক্রমেই পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। প্রথমে সেটাকে খুব ছোট দেখাত, কিন্তু যতই পৃথিবীর কাছে আসতে লাগল ততই সেটা বেশি স্পষ্ট আর বেশি মস্ত হয়ে দেখা দিতে লাগল। শেষে সেটাকে একটা প্রকাণ্ড উজ্জ্বল ঝাঁটার মতন দেখাত। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা অনেক হিসাব করে বললেন, পৃথিবীটা শেষে ধূমকেতুর লেজের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ওই ধূমকেতুতে প্রচুর পরিমাণে 'লাফিং গ্যাস' নামে গ্যাস থাকা সম্ভব; পৃথিবীর লোকেরা ওই গ্যাস শুঁকে হাসতে হাসতে মরে যেতে পারে। এই কথা শুনে অনেকে ভয় পেল। আবার কেউ কেউ বলল, 'মরতেই যদি হয় তবে হাসতে হাসতে মরাই ভাল; সকলে একসঙ্গে হাসতে হাসতে মরব।' পৃথিবীটা শেষে সত্যিই ধূমকেতুকে পার হয়ে চলে গেল বটে, কিন্তু লাফিং গ্যাসের কিছুই টের পাওয়া গেল না। তখন কেউ হাসেনি বটে, কিন্তু তার কয়েক দিন আগে সুকুমার রায় এমন একটা কথা বলেছিলেন যা শুনে আমরা খুব হেসেছিলাম।

কলকাতার ময়দানে (গড়ের মাঠে) একদিন একজন পাদ্রিসাহেব আঙুল দিয়ে সেই ঝাঁটার মতন ধূমকেতুটা দেখিয়ে লোকদের সব বোঝাচ্ছিলেন। আমাদের একজন চেনা লোক তাই দেখে এসে তার বন্ধুদের কাছে পাদ্রিসাহেবের বক্তৃতার কথা বলছিল। একজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'পাদ্রিসাহেব কী-সব কথা বলছিলেন?' সুকুমার সেই ঘরে উপস্থিত ছিলেন। সেই চেনা লোকটি উত্তর দেবার আগেই সুকুমার সকলকে হাসাবার জন্য বলে উঠলেন, 'পাদ্রিসাহেব ধূমকেতু দেখিয়ে লোকদের বলছিলেন—'তোমরা পাপ করিলে ঐ ঝাঁটার দ্বারা তোমাদের প্রহার করা হইবে'।'

পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় ১৯১৫ সনের ২০শে ডিসেম্বর ১০০ নম্বর গড়পার

রোডে দেহত্যাগ করলে পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকুমার 'সন্দেশ' পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন। তাঁর লেখাগুলি ছেলেমেয়েদের যেমন আনন্দ দিত, বড়দেরও তেমনি আনন্দ দিত। প্রায় ছবছর পরে, ১৯২১ সনে, সুকুমার কঠিন কালাজ্বরে আক্রান্ত হন। এখন কালাজ্বরের যেমন ভাল চিকিৎসা হয় তখনকার দিনে ঠিক ততটা ভাল চিকিৎসা ছিল না। অনেক চিকিৎসার পরেও সুকুমারের শরীরে ঐ রোগ থেকেই গেল। সুকুমারের কবিতা-লেখা কিন্তু বন্ধ হল না।

অসুখের মধ্যেও তাঁর মন প্রসন্ন আর বুদ্ধি উজ্জ্বল ছিল। সুকুমার তখন ১০০ নম্বর গড়পার রোডের বাড়ীতে ছিলেন। রোগের প্রায় শেষ অবস্থাতেও তিনি কবিতা লিখেছেন। রোগের অবস্থা যখন অত্যন্ত কঠিন তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিন সন্ধ্যার পরে এসে সুকুমারকে কতকগুলি গান শুনিয়ে গেলেন। সুকুমার খুব আনন্দ পেলেন। রবীন্দ্রনাথের গান সুকুমারের বড় প্রিয় জিনিস ছিল। সুকুমারের মৃত্যুর মাত্র দুই-এক দিন আগেও যাঁরা দেখা করতে এসেছেন তাঁদের একজনকে বলতে শুনেছি, 'ওর চোখ দুটো বুদ্ধিতে উজ্জ্বল দেখলাম।' শেষ দিন (১৯২৩ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর) ভোরবেলায় ভূমিকম্পে কলকাতা শহর কয়েক সেকেণ্ডের জন্য কেঁপে উঠল। সেই সকালেই সুকুমার দেহত্যাগ করলেন। সেই দিনই একজন সকালের ভূমিকম্পের কথা বলছিলেন। তাই শুনে আর একজন বললেন, 'সুকুমারের মৃত্যুই সকলের পক্ষে এত বড় একটা ভূমিকম্পের মতন ব্যাপার যে অন্য ভূমিকম্পটা ছোট মনে হচ্ছে।'

কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের মন্দিরে প্রথম সুকুমারের স্মৃতি-সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হয়েছিলেন। সেই সভায় অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সুকুমারের লেখা একটি চিঠি পড়ে শোনান। চিঠিখানি সুকুমারের অসুখ (কালাজ্বর) আরম্ভ হবার সাত মাস আগেই সুকুমার প্রশান্তবাবুকে লিখেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, অতদিন আগেই সুকুমার সেই চিঠিতে লিখেছিলেন যে তাঁর জীবনে একটা গুরুতর পরিবর্তন আসছে বলে তিনি বুঝতে পারছেন আর তাঁর পৃথিবীর দিনও ফুরিয়ে আসছে। চিঠি পড়া হলে, শেষে রবীন্দ্রনাথ সুকুমারের সম্বন্ধে বললেন। কঠিন রোগের মধ্যেও সুকুমারের মনের যে অসাধারণ ধৈর্য আর শক্তি রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, রোগজীর্ণ দেহের মধ্যে সুকুমারের অন্তরের আনন্দের আর প্রসন্নতার যে পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন সেই কথা তিনি তাঁর অতুলনীয় ভাষায় বর্ণনা করলেন। সকলে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি শুনেছিলেন।

চোরের সঙ্গে চোখাচখি

অনেক বছর আগে ২২নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে থাকতাম। এখন রাস্তাটার নাম হয়েছে কৈলাস বোস স্ট্রিট। আমাদের বাড়ীর পিছনে বা দক্ষিণে আমাদের বাড়িওয়ালা যদুনাথ বরাট মহাশয়ের প্রকাণ্ড বাগান, আর সেই বাগানের পিছনে বা দক্ষিণ ধারে বাড়িওয়ালার থাকবার বাড়ি। যদুবাবুর দুই ছেলে পূর্ণবাবু আর ফণীবাবু মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়িতে আসতেন। একদিন গভীর রাত্রে তাঁদের বাড়ির তেতলার একটা ঘরে তাঁদের একজন ঘুম থেকে উঠে জল খাচ্ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা চোর সেই ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ভদ্রলোকটিও চোরকে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে—'চো—ও—ও' বলে চিৎকার করতে লাগলেন; তাঁর গলা কেঁপে যাওয়াতে 'চোর' কথাটা তিনি ভাল করে উচ্চারণ করতে পারছিলেন না। তাঁর চিৎকার শুনে নিচের তলার লোকেরা জেগে গেল। চোরটা তখন পাশে একটা নিচু ছাদে লাফিয়ে পড়ে একটা পাঁচিলে নেমে লাফ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করল। পাশের গলির নাম শিবনারায়ণ দাশ লেন, কিন্তু পাড়ার লোকেরা জেগে যাওয়াতে চোরের পক্ষে সেই গলিতে যাওয়া সম্ভব হল না। কাছেই একটা জায়গায় সে অতি সাবধানে লুকিয়ে রইল। হৈ চৈ থেমে গেলে পরে ভোরবেলায় সে ছুটে পালাতে গেল, কিন্তু এক মোটা দারোয়ানের সঙ্গে হঠাৎ খুব জোরে তার ধাক্কা লেগে গেল। দারোয়ান খপ করে তাকে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কে রে ? আমাকে ধাক্কা দিলি কেন ?' চোর যতই বলে, 'আমার বড্ড কাজ, আমাকে ছেড়ে দাও,' দারোয়ান ততই বলে 'তুই কে ? ছটফট করছিস কেন ?' গোলমাল শুনে সেখানে লোক জড়ো হয়ে গেল, আর কেউ কেউ তাকে চিনতে পারল। তখন চোরকে কিছু উত্তম-মধ্যম-অধম আর কিঞ্চিৎ দমাদম দিয়ে, বেশ একটু উপদেশ দিয়ে, ছেড়ে দিল। এই ঘটনার কথা আমি ছেলেবেলায় আমার মেজদাদার (স্বর্গত সুবিনয় রায়) কাছে শুনেছিলাম।

'ড্যাং ড্যাং খটখট'

আমাদের চেনা প্রফুল্লবাবু (বসু) কটকের এক স্কুলে পড়াতেন। তিনি হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসাও করতেন। একবার রাত্রে তিনি গোরুর গাড়িতে ভুবনেশ্বরের এক পাড়াগেঁয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথের একটা পাশ ঘেঁষে একটা নালা ছিল, আর অন্য পাশে একটা ক্ষেত। চাঁদের আলোয় পথ দেখা যাচ্ছিল। প্রফুল্লবাবু হঠাৎ দেখতে পেলেন যে সামনে অল্প দূরে একটা বাঘ নালার ধারে চুপ করে বসে আছে। বাঘেব সামনে দিয়ে যাওয়া কিছুতেই চলে না, আবার সেখানে গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করলেও বাঘটা সহজেই তাঁদের আক্রমণ করতে পারে। গাড়ির গোরু দুটো ভয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। গাড়োয়ান গাড়িটাকে রাস্তার অন্য ঢালু পাশ দিয়ে ক্ষেতেব মধ্যে নামিয়ে দেবার জন্য গোরু দুটোকে তাড়া দিল। গোরু দুটো যেমনি গাড়ি নিয়ে বেঁকেছে, অমনি সেই পুরনো গাড়ির একটা নড়বড়ে চাকা ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে 'ড্যাং ড্যাং খটখট,' 'ড্যাং ড্যাং খটখট' করতে করতে গড়িয়ে এগিয়ে চলল। বাঘের তো চক্ষুস্থির! সে এমন অদ্ভুত ব্যাপার আগে কখনও দেখেনি। চাকাটা মনের আনন্দে একটু গড়িয়ে নিয়ে হেলেদুলে থেমে গিয়ে শুয়ে পড়ল। বাঘটা আর দেরি না করে একলাফে নালা টপকে পালিয়ে গেল। প্রফুল্লবাবু অদ্ভুতভাবে বেঁচে গিয়ে আরামের নিশ্বাস ফেললেন।

কবরের কাছে

এই ঘটনাটি অনেক বছর আগে চুনারে ঘটেছিল—আমার জন্মেরও দুই-এক বছর আগে। আমার মেজকাকার (স্বর্গত কুলদারঞ্জন রায়) কাছে গল্পটা শুনেছিলাম। আমার জ্যাঠামশাই বাবা মা কাকারা দাদারা দিদিরা সকলে তখন চুনারে গিয়েছিলেন। সেখানে তখন বেশি ঘরবাড়ি ছিল না, তবে বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখবার মতন বন, পাহাড়, পাহাড়ী নদী এইসব ছিল। সকলে দল বেঁধে বেড়াতে বেরোতেন। একদিন বেড়াতে বেড়াতে তাঁরা একটা নির্জন রাস্তার ধারে একটা টিপির উপর একটা কবর দেখতে পেলেন। তাঁরা ঠিক করলেন যে যদি কেউ রাত্রে একা সেখানে গিয়ে ঐ টিপিতে উঠে কবরের উপরে নিজের রুমাল রেখে আসতে পারে তবে তাকে পাঁচ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

সেই দলে আমাদের একজন আত্মীয় ছিলেন; তাঁকে আমরা 'নিদানদাদা' বলে ডাকি। তিনি বললেন, 'আমি ওখানে রুমাল রেখে আসতে পারব।' কথা রইল যে নিদানদাদা যদি রাত্রে একা গিয়ে ঢিপিতে চড়ে রুমাল রেখে আসতে পারেন তবে তাঁকে পাঁচ টাকা দেওয়া হবে।

তারপরে একদিন নিদানদাদা রাত্রের খাওয়া সেরে নিয়ে সত্যিই একা সেই ঢিপির দিকে রওনা হলেন। আমার কাকারা দূরে আড়ালে থেকে তাঁর পিছনে পিছনে নিঃশব্দে যেতে লাগলেন নিদানদাদা কিছু টের পেলেন না। কাকাদের ইচ্ছা ছিল যে নিদানদাদা কিভাবে যান আর কী কী করেন তা তাঁরা দেখবেন।

নিদানদাদা বাংলাদেশের একজন প্রসিদ্ধ সাধুর শিষ্য ছিলেন; ভাল গান গাইতে আর কীর্তন করতে পারতেন। তিনি হনহন করে বেশ জোরে হেঁটে চললেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি বেশ নিশ্চিন্তভাবেই যাচ্ছেন বলে কাকাদেব মনে হল। সেই ঢিপি যখন আর বেশী দূরে নেই তখন নিদানদাদা গান গাইতে আরম্ভ করলেন। বোঝা গেল যে তাঁর গা ছমছম করছে আর তিনি একটু একটু অসোয়াস্তি বোধ করছেন; সাহস বাড়াবার জন্য গান ধরেছেন। তিনি ঢিপির দিকে যতই এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর গানের জোর ততই বেড়ে যাচ্ছিল। কাকারা পেছনে দূরে থেকে সব শুনতে পাচ্ছিলেন।

নিদানদাদা ঢিপির নিচে পৌঁছে হঠাৎ থেমে গেলেন। ঢিপির উপর উঠে, কবরের কাছে যাবার সাহস তাঁর হল না। তিনি নিচে দাঁড়িয়েই রুমালটা হাতে নিয়ে মুড়ে দলা পাকিয়ে কবরের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আর দৌড়ে ফিরে আসতে লাগলেন। কিছু দূর আসতেই কাকাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি চমকে আর একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'অ্যাঁ, তোমরা লুকিয়ে থেকে সব দেখছিলে?' কাকারা বললেন, 'রুমালটা ওভাবে ছুঁড়ে ফেলবার তো কথা ছিল না! ঢিপিতে উঠে কবরের উপর রুমাল রেখে আসতে বলা হয়েছিল। তুমি যেরকম হনহনিয়ে রওয়ানা হয়েছিলে তাতে আমরা ভাবছিলাম যে তুমি কেমনভাবে রুমালটা রাখ সেটা দেখতে হবে।' পরে তাঁরা গল্প করতে করতে ফিরে এলেন। নিদানদাদা ঢিপিতে ওঠেননি আর রুমালটা ঠিক কবরের উপর পড়েনি, তাই পুরস্কার পেলেন না।

বাঘা-উলা

ময়মনসিংহের এক গ্রামের ধারে একটা উঁচু জমির উপর ঝোপঝাড় আর লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়েছিল। দূরে জঙ্গলও ছিল। একদিন একটা চিতা বাঘ সেই গ্রামের পাশে উপস্থিত হয়। লোকেরা চিৎকার করাতে বাঘটা সেই উঁচু জমির ঝোপের আর ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। বাঘটার সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করবার জন্য লোকেরা সেখানে জড় হয়ে পরামর্শ করতে থাকে।

সেই গ্রামের এক ভদ্রলোক লাঠি হাতে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন। তিনি বেড়াতে বেড়াতে সেইখানে এসে লোকদের মুখে বাঘের কথা শুনতে পেলেন, কিন্তু তাদের কথা মোটেই বিশ্বাস করলেন না। তিনি বললেন, 'তোমরা বাঘ-বাঘ করছ কেন ? বাঘ আবার কোথা থেকে আসবে ?' সকলে বলল, 'ঐ ঝোপজঙ্গলের মধ্যে বাঘ লুকিয়ে রয়েছে।' ভদ্রলোক তখন সেই জংলা জমির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

সকলে চিৎকার করে তাঁকে বলতে লাগল, 'আপনি যাবেন না, যাবেন না, যাবেন না, ওখানে সত্যিই বাঘ আছে।' ভদ্রলোকটি কিন্তু নিজের জেদ কিছুতেই ছাড়লেন না। তিনি বললেন, 'তোমাদের যত কথা ! খালি বাঘ, বাঘ আর বাঘ ! অসম্ভব !' এই বলে তিনি লাঠি দিয়ে ঝোপ ফাঁক করে উঁকি দিয়ে দেখলেন ; আর একটু ভিতরেই দুটো জ্বলজ্বলে চোখ দেখতে পেলেন। একেবারে বাঘের সঙ্গে চোখাচোখি !

তখন ভদ্রলোকটির এক অদ্ভুত অবস্থা হল। তিনি পালাতেও পারছেন না, বাঘটাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করতেও পারছেন না, সাহায্যের জন্য চিৎকার করতেও পারছেন না, সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি 'উলু-লুলু—লুলু-লুলু—উলু-লুলু—লুলু-লুলু' এইরকম একটা শব্দ করছেন আর ক্রমাগত হাতের লাঠিটা একবার বাঘের দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন, আবার গুটিয়ে নিচ্ছেন, আবার বাড়িয়ে দিচ্ছেন, আবার হটিয়ে নিচ্ছেন, আর কাঁপছেন।

লোকেরা বলল, 'ওঁকে বাঘা-উলায় পেয়েছে, এখুনি ওঁকে সরিয়ে আনা দরকার।' সকলে তখনি তাঁকে টান দিয়ে সরিয়ে নিয়ে এল। ভদ্রলোকটির মাথা তখন ঠিক হল ; তিনি শান্ত হলেন। বাঘটা বোধ হয় শেষে পালিয়ে গিয়েছিল।

আমার মেজকাকার কাছে এই ঘটনার কথা শুনেছিলাম। 'বাঘা-উলা' কথাটাও প্রথমে তাঁর কাছেই শুনি।

রাম মাঝি, সুন্দর মাঝি

ছেলেবেলায় স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি বা পুজোর ছুটি আরম্ভ হলে মধ্যে মধ্যে আমার মা-বাবার সঙ্গে গিরিডিতে বেড়াতে যেতাম। দাদা-দিদিদের মধ্যেও কেউ কেউ যেতেন। আমার কাকাদের মধ্যেও কেউ কেউ তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানে যেতেন। সকলে দল বেঁধে বেড়াতে যাওয়া হত। বন-জঙ্গলে আর খানা-খন্দে ঘুরতাম, ছোট বড় নানারকম টিলা বা ঢিপির উপরে উঠতাম।

তখন গিরিডিতে ঘরবাড়ি কম ছিল ; জায়গাটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা ছিল। উস্রি নদীর একধারে গিরিডি শহর আর অন্যধারে শালবন ছিল, সেই জঙ্গলে অন্য অন্য গাছও যথেষ্ট ছিল। সকালে আর বিকালে আমরা সেখানে বেড়াতে যেতাম। প্রায় প্রত্যেকের হাতেই একটা লাঠি থাকত। দিনের বেলায় আমরা সেখানে সাপ আর শেয়াল ছাড়া অন্য কোনরকমের জানোয়ার বড় একটা দেখতে পাইনি, কিন্তু রাত্রে সেখানে হায়েনা ভাল্লুক, এইসব জানোয়ার চলাফেরা করত ; চিতা বাঘও মধ্যে মধ্যে সেখানে আনাগোনা করত বলে শুনেছি। শুনেছি, অনেক বছর আগে নদীর এপারে শহরের ধারেও চিতা বাঘ আর ভাল্লুক দেখা গিয়েছিল।

একবার আমরা গিরিডিতে আশুবাবুর বাড়িতে ছিলাম। একতলা বাড়ি, সামনের বারান্দাটা বাড়ির বাইরেও কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছে, আর শেষে সামনের অংশটা জুড়ে বাঁধানো সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে নীচের জমিতে মিশে গিয়েছে। তার পরে সামনের প্রায় তুশো হাত পর্যন্ত ফাঁকা মাঠের মতন ছিল ; সেই জায়গাটুকুতে তখনকার দিনে ঘরবাড়ি ছিল না, তবে কয়েকটা গাছ ছিল।

আমরা সন্ধ্যার পরে সামনের বারান্দায় একটু বসতাম আর রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে বারান্দার সামনের ভাগে বসে গল্প করতাম। অনেক বিষয়েই কথা হত তবে সাধারণত গিরিডির বন-পাহাড়ের কথা আর সেখানকার নানারকম জানোয়ারের গল্প হত।

তখন গিরিডিতে চোরের উৎপাত ছিল। সেখানকার সাঁওতালরা কিন্তু চুরি করত না। সাঁওতালরা প্রায় সকলেই খুব সরল আর সৎপ্রকৃতির মানুষ। চোরদের অধিকাংশই ছিল বাইরের লোক।

রাত্রে বাড়ি পাহারা দেবার জন্য তুজন সাঁওতাল পাহারাদারকে রাখা হয়েছিল। একজনের নাম রাম মাঝি, অন্যজনের নাম সুন্দর মাঝি। তুজনেই ছিল বেশ সাহসী, শান্ত আর ভদ্র। সকলেই তাদের খুব বিশ্বাস করত। রাম মাঝি ছিল

বয়সে বড়, একটু বুড়ো হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নিজের কাজে বেশ পটু ছিল। সুন্দর মাঝি বয়সে ছোট, তাই বেশী জোয়ান ছিল।

রাত্রে তারা দুজনে টাঙি আর তীর ধনুক হাতে নিয়ে বাড়ি পাহারা দিত। রাম মাঝি যতক্ষণ জেগে থাকত সুন্দর মাঝি ততক্ষণ ঘুমিয়ে নিত; আবার রাম মাঝি যখন ঘুমোতে যেত সুন্দর মাঝি তখন পাহারা দিত। সকাল হলে তারা আমাদের নমস্কার করে নিজেদের বাড়িতে ফিরে যেত। রাত্রে আবার হাজির হত।

আমরা একদিন ভাবলাম যে রাম মাঝি আর সুন্দর মাঝির মধ্যে কে বেশী ভাল তীব ছুঁড়তে পারে সেটা পরীক্ষা কবে দেখতে হবে। দুজনকেই কিছুদূরের একটা জিনিস দেখিয়ে দিয়ে সেটাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে বলা হল। দেখা গেল যে দুজনেই ওস্তাদ তীরন্দাজ হলেও রাম মাঝি একটু বুড়ো হয়ে যাওয়াতে তার হাত একটু কেঁপে যায়; সুন্দর মাঝির হাত খুব স্থির থাকে আর তার চোখের দৃষ্টিও বোধ হয় বেশি পরিস্কার।

রাত্রে আমরা মধ্যে মধ্যে হায়েনার ডাক শুনতে পেতাম। হায়েনা এক অদ্ভুত জন্তু; নেকড়ের মতন বড় হয়, কিন্তু মুখের চেহারা অন্যরকম। সামনের পা দুটো পেছনের পায়ের চেয়ে বেশী লম্বা হয়। ওতে হায়েনাকে আরো অদ্ভুত দেখায়। হায়েনার ডাক শুনতে বিকট হাসির মতন। হায়েনা মানুষকে সহজে আক্রমণ করে না, বরং এড়িয়ে চলে। তবে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট ছেলেদের আক্রমণ করে, আর ঘুমন্ত মানুষকেও আক্রমণ করতে দেখা গিয়েছে। মরা মানুষের আর মরা জন্তুর বাসি মাংস খেতে হায়েনা খুব ভালবাসে।

গিরিডির সেই বাড়ির বারান্দায় সামনে (পশ্চিমে) কিছুদূর পর্যন্ত ফাঁকা মাঠের মতন; বাড়ির পেছনে (পুবে) তিন-চারটা বাড়ি পার হয়ে গেলেই উস্রি নদী। নদীর ধার থেকে একটা শুকনো নালা উঠে এসে পশ্চিমের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আমাদের বাড়ির বাঁ পাশ (অর্থাৎ দক্ষিণ ধার) দিয়ে গিয়ে সামনের সেই মাঠের ধারে এসে শেষ হয়েছে। উস্রি নদীটা বেঁকে গিয়েছে বলে বাড়ির পেছনে (পুবে) কিছুদূরে যেমন উস্রি নদী, বাড়ির সামনের মাঠের ডান দিকেও (অর্থাৎ উত্তরদিকেও) কিছুদূরে তেমনি আবার উস্রি নদী পাওয়া যায়।

একদিন আমরা রাত নটার পরে সেই বারান্দায় বসে গল্প করছিলাম। হঠাৎ পুবের সেই নালার মুখে একটা অস্পষ্ট ধুপ ধুপ শব্দ শোনা গেল, আর সঙ্গে সঙ্গেই দুটো হায়েনাকে দেখা গেল। তারা বারান্দার সামনের সেই ফাঁকা জমির উপর

দিয়ে কোনাকুনিভাবে ছুটে যেতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাদের পায়ের ধুপ ধুপ শব্দ মিলিয়ে গেল, একটু পরে তারা নিজেরাও উত্তর-পশ্চিমের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

আমরা 'হায়েনা—হায়েনা—' বলতে বলতে ঘরে ঢুকে গেলাম আর হায়েনার কথা বড়দের জানিয়ে দিলাম। এর পরেও দু-একদিন রাত প্রায় দশটায় হায়েনা দুটোকে ঐভাবে ছুটে যেতে দেখা গেল। তখন সাঁওতাল্ পাহারাদারদের কথা আমাদের মনে হল।

ওরা পাহারা দিতে আরম্ভ করবার কিছু আগেই হায়েনা এসে চলে যেত, তাই ওদের সঙ্গে হায়েনার দেখা হত না।

আমরা ভাবলাম যে রাম মাঝি আর সুন্দর মাঝি যদি হায়েনা আসবার আগেই সেই শুকনো নালার মধ্যে গিয়ে অন্ধকারে কোথাও লুকিয়ে থাকে তবে হায়েনা এলেই সেদিকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে পারবে।

আমাদের মতলবের কথা ওদের জানিয়ে দেওয়া হল। ওরা শুনে বেশ খুশীই হল; সাঁওতালরা তো ঐ ধরনের কাজ পছন্দই করে। আমরাও ভাবছি যে এই-বারে হায়েনারা বেশ জব্দ হবে, রাত্রে বেশ তামাসা দেখা যাবে। দিনের বেলায় ভাবছি, দিনটা তাড়াতাড়ি শেষ হোক; সন্ধ্যা হয়ে এলে ভাবছি, রাতটা তাড়াতাড়ি এসে পড়ুক।

শেষে সত্যিই রাত এসে পড়ল। আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে সামনের বারান্দায় গিয়ে বসলাম। রাম মাঝি আর সুন্দর মাঝি তীরধনুক আর টাঙি সঙ্গে নিয়ে সেই নালার দিকে গেল আর অন্ধকারে এমন কায়দা করে গা ঢাকা দিয়ে রইল যে আমরা দেখতেই পাচ্ছিলাম না ওরা কে কোথায় বসেছে। ওরা ঝোপের আড়ালেই লুকিয়ে রইল, না পাথরের বা ঢিপির পেছনে বসে পড়ল, কিছুই বোঝা গেল না।

এদিকে আমরা কান খাড়া করে নালার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বারান্দায় বসে আছি। হায়েনার কথা ভেবে ভেবে উৎসাহে আমাদের গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। কোথাও একটু খচমচ শব্দ হলেই আমরা ভাবছি ঐ বুঝি হায়েনা আসছে।

হঠাৎ দেখি, দুটো হায়েনা নালার মুখ দিয়ে বেরিয়েই হন্তদন্ত হয়ে দুরন্ত ঝড়ের মতন ছুটে সামনের সেই ফাঁকা জমির উপর দিয়ে পালাতে লেগেছে। ওরা বোধহয় পাহারাদারের গায়ের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল অথবা অন্য কোন উপায়ে টের পেয়ে গিয়েছিল যে ওদের উপর দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। একেবারে প্রাণপণে রাম

টকাটক, রাম টকাটক, রাম টকাটক করে লাফাতে লাফাতে আর ছুটতে ছুটতে হায়েনা দুটো কয়েক নিমেষের মধ্যেই দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

হায়েনারা এসেই এমন ভূতের মতন অদ্ভুত জোরে দৌড় দিয়েছিল যে ওদের গায়ে তীর লাগানো সম্ভব হয়নি। রাম মাঝি আর সুন্দর মাঝি নালার ধার থেকে ফিরে এল। ওরা খুব আশা নিয়েই হায়েনার অপেক্ষায় বসে ছিল, কিন্তু সেয়ানা হায়েনা দুটো ওদের এমনই ফাঁকি দিল যে সেদিনকার আসল মজাটা মাটি হয়ে গেল। তবু বেশ একটু আনন্দে আর উত্তেজনায় সময়টা কেটেছিল।

এরপরে আমরা আর কোনদিনই বাড়ির সামনে হায়েনা দেখতে পাইনি, ওরা চিরদিনের মতো সাবধান হয়ে গিয়েছিল।

এর পরেও আমরা মধ্যে মধ্যে গিরিডিতে বেড়াতে গিয়েছি। রাম মাঝি অনেক বছর বেঁচেছিল, তার সঙ্গে অনেকদিন পরেও দেখা হয়েছিল। সুন্দর মাঝির আর দেখা পাইনি। সে বোধহয় অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল।

সাহেবে-কাবুলীওয়ালাতে

এর আগে লিখেছি যে শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি বাঘের খেলা দেখাতেন) যখন সন্ন্যাসী হয়ে যান তখন 'তিব্বতীবাবা' নামে একজন খুব প্রাচীন যোগী শ্যামাকান্তবাবুর 'সোহহং স্বামী' নাম রাখেন। তিব্বতীবাবা বাঙালী ছিলেন, কিন্তু অনেক বছর তিব্বতে কাটিয়েছিলেন বলে লোকে তাঁকে তিব্বতীবাবা বলত।

তিব্বতীবাবা একবার বর্মায় গিয়ে সেখানকার রেলগাড়িতে ওঠেন; সঙ্গে একজন কাবুলীওয়ালা ছিল। কাবুলীওয়ালার সঙ্গে কিছু হিং ছিল, তাই গন্ধ বেরিয়েছিল।

তখন সে দেশে ইংরেজদের খুব প্রতাপ ছিল, আর সাহেবদের মধ্যে কেউ কেউ সেখানে ভারতবাসীর আর এশিয়ার অন্য অন্য দেশের লোকের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করত।

ট্রেনের যে কামরায় তিব্বতীবাবা উঠেছিলেন ঠিক সেটাতেই একজন বদরাগী ইংরেজ এসে উঠল আর উঠেই হিঙের গন্ধ পেল। কার গা থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে সেটা ঠিক বুঝতে না পেরে সাহেব একবারে কটমট করে কাবুলীওয়ালার দিকে

তাকাচ্ছে, আবার তিব্বতীবাবার দিকেও বিরক্ত হয়ে ফিরে চাইছে আর দুজনকেই উদ্দেশ্য করে বলছে 'বেজায় দুর্গন্ধ! বেরিয়ে যাও।'

সাহেব যতই দুজনকে বেরিয়ে যেতে বলে, কাবুলীওয়ালা ততই গ্যাঁট হয়ে বেঞ্চিতে চেপে বসে আর তিব্বতীবাবাকেও বলে, 'আপনিও বসুন, আপনি উঠবেন না।'

তখন সাহেবের সঙ্গে কাবুলীওয়ালার ভয়ানক তর্ক বেধে গেল; দুজন দুজনের দিকে এগিয়ে গেল। রেলগাড়ী ততক্ষণে চলতে আরম্ভ করেছে। সাহেব রেগে গিয়ে ধড়াস করে একটা লাথি বসিয়ে দিল; কাবুলীওয়ালাও সাহেবের গালে একটা বোম্বাই চড় লাগিয়ে দিল। সেই এক চড়েই সাহেবের একটা দাঁত ভেঙে গেল।

এরপর সাহেবে-কাবুলীওয়ালাতে ভীষণ গুঁতোগুঁতি, ঠেলাঠেলি, ধস্তাধস্তি লেগে গেল। রেলগাড়ি ততক্ষণে স্টেশনের বাইরে এসে পড়েছে, তবে বেশি জোরে চলছে না।

কাবুলীওয়ালা সাহেবকে ঠেলতে ঠেলতে দরজার দিকে নিয়ে গিয়ে পাঁজা করে

তুলে নিয়ে গাড়ির বাইরে ফেলে দিল। কিছু পরে তার খেয়াল হল যে সাহেব স্টেশনে ফিরে গিয়ে নালিশ কবতে পারে। তখন সে নিজেও তার বোঁচকা নিয়ে লাফিয়ে পড়ল।

তিব্বতীবাবা তাঁর সঙ্গীকে ঐভাবে লাফিয়ে পড়তে দেখে নিজেও লাফিয়ে পড়লেন। তিনি হাতে-পায়ে একটু চোট পেলেন। কাবুলীওয়ালাব লাফঝাঁপ দিয়ে অভ্যাস ছিল, তাই তাব সামান্যই লেগেছিল। কিছুদিন পরে তিব্বতীবাবা খবব পেলেন যে সেই বদরাগী সাহেব স্টেশনে গিয়ে জানিয়েছিল, 'একজন কাবুলীওয়ালা আব একজন সাধু মিলে আমাকে রেলগাড়ি থেকে ফেলে দিয়েছে।'

তিব্বতীবাবা একবারও সাহেবের গায়ে হাত দেননি, কিন্তু সাহেব স্বীকার করতে চায়নি যে সেই কাবুলীওয়ালা একাই তাকে হারিয়ে দিচ্ছিল। তাই মিথ্যে মিথ্যে তিব্বতীবাবার কথাও বলেছিল।

এই ঘটনাব কথা আমি কলকাতায় তিব্বতীবাবার মুখেই শুনেছিলাম। তিনি এমনভাবে এই ঘটনার কথা বলেছিলেন যে আমাদের শুনতে বেশ ভালো লাগছিল। তিনি কথা কম বলতেন, উপদেশও অল্পকথায় দিতেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বেশ প্রাণ খুলে গল্প করতেন।

কিসের ভয়ে পালাল ওরা?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছেলেবেলায় একবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটা ভয়ের জায়গায় গিয়ে খুব সাহস দেখিয়েছিলেন। কলকাতায় তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়িটা একবার আগাগোড়া

মেরামত করাবার দরকার হয়, আর কিছুদিনের জন্য বাড়িটা ছাড়তে হয়। তখন সেই বাড়ির সকলে নৈনান নামে একটা জায়গায় বাড়ি ভাড়া করে সেখানে গিয়ে কিছুদিনের জন্য রইলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁদের সঙ্গে গেলেন।

নৈনানের এই বাড়িটা একটা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি। বাড়ির বাগানটা খুব বড়। বাগানের মধ্যেই বাড়িটার কিছুদূরে রান্না-বাড়ি। বড় বড় গাছ দিয়ে ঘেরা এই রান্না-বাড়ির সামনে একটা ঘাট-বাঁধানো পুকুর। এই ধরনের জায়গা ছেলেদের খুব ভাল লাগে, তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথও এখানে এসে বেশ আনন্দ পেতে লাগলেন।

সময়টা ভালভাবেই কাটবার কথা, কিন্তু এর মধ্যে একটা অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হয়ে গেল, চাকরদের মধ্যে কিসের একটা খুব ভয় দেখা দিল। বেশি রাত্রে চাকরেরা রান্নাঘরের সামনে দিয়ে গেলেই ভয়ে তাদের দাঁতে দাঁত লেগে যায় আর তারা মাটিতে শুয়ে পড়ে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভাবলেন যে চাকরেরা সামান্য কারণেই ভয় পাচ্ছে। পরে একদিন একজন চাকর ভয়ে মরেই গেল। ঐ বাড়িতে 'ঝিনু' নামে একজন পিয়ন ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়নকে ডেকে এই ভয়ের ব্যাপারের সব কথা জানতে চাইলেন। পিয়ন উত্তর দিল যে রাত্রে রান্নাঘরের সামনে একজন মানুষ একটা মস্ত পাগড়ী মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে, তার চেহারা অনেকটা রাজা রামমোহন রায়ের মতন আর পাগড়ীও রামমোহন রায়ের পাগড়ীর মতন।

ছেলেবেলায়ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটুও ভূতের ভয় ছিল না। তিনি ঠিক করলেন যে তিনি রাত্রে একলা গিয়ে দেখবেন যে সেখানে ঐরকম অদ্ভুত মানুষ কে আসে। গভীর রাত্রে একা রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কাছাকাছি গিয়ে সত্যিই দেখতে পেলেন যে একজন অদ্ভুত মানুষ একটা প্রকাণ্ড পাগড়ী মাথায় দিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই দেখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভয় পেলেন, কিন্তু নিজের সাহসের উপর তাঁর খুব বিশ্বাস ছিল। তিনি সাহস করে এগিয়ে গেলেন। খুব কাছে গিয়ে দেখলেন যে দেয়ালের খানিকটা চুন-বালি খসে গিয়ে সাদা সাদা আর কালো কালো দাগ হয়েছে, আর সমস্তটা মিলে রাত্রের অস্পষ্ট আলোতে একটা পাগড়ী-পরা মানুষের মতন দেখায়।

তিনি চাকরদের ডেকে সেটা দেখালেন আর সব বুঝিয়ে দিলেন। তখন থেকে ওরা আর ভয় পেত না। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ওদের হাসি পেয়ে গেল।

জঙ্গলে মঙ্গল-কাজ

আমাদের চেনা শ্রীশবাবু খুব বিদ্বান্ আর ভাল লোক ছিলেন। তাঁর পুরো নাম ছিল শ্রীশচন্দ্র রায় বেদান্তভূষণ। তিনি একবার পাল্‌কি চড়ে একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে এক জায়গায় তিনি একটা নতুন রকমের ব্যাপার দেখতে পেয়ে একটু অবাক হয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন যে একটা গাছের কোটরে পাখিরা খালি ঢুকছে আর বেরোচ্ছে, ঢুকছে আর বেরোচ্ছে।

শ্রীশবাবু পাল্‌কি থেকে নেমে গাছের দিকে এগিয়ে গেলেন। পাখিদের ঐ রকম অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ জানতে তাঁর খুব ইচ্ছা হয়েছিল। কাছে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, ঐ গাছের খোঁড়লের মধ্যে এক অদ্ভুত কাণ্ড চলেছে—একটা বুড়ো অন্ধ শকুন ঐ খোঁড়লের মধ্যে বসে আছে, আর পাখিরা ঠোঁটে করে খাবার এনে শকুনটাকে খাইয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, শকুনটা বেশি বুড়ো হয়ে যাওয়াতে চোখে প্রায় দেখতে পায় না, খাবার খুঁজতে যেতে পারে না। পাখিদের সাহায্য পেয়ে শকুনেরও বেশ সুবিধা হয়েছে, সে মুখ হাঁ করে করে পাখিদের দেওয়া খাবারগুলো খাচ্ছে।

বনের মধ্যে পাখিদের এমন সুন্দর কাজ দেখে শ্রীশবাবুর বড় ভাল লেগেছিল।

বাঘা কুকুরের তেজ

বক্সার ডগ (Boxer Dog) বলে একরকম সাহসী কুকুর আছে, বেশ বড় রকমের কুকুর। এদের মুখ বুলডগের মুখের মতন ভোঁতা হয়। এদের মাথাও বুলডগের মাথার মতন গোল, কিন্তু আরো বড়। এরা বদরাগী নয়, কিন্তু খুব তেজী। দরকার হলে বড় বড় জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করতে এরা একটুও ভয় পায় না। লড়াই থামিয়ে না দিলে এরা লড়তে লড়তে বরং মরে যেতে রাজী থাকে, কিন্তু একটুও পিছু হটে না।

একবার একজন সাহেব একটা বনে শিকার করতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে তাঁর পোষা দুটো বক্সার ডগ ছিল। সেই বনের বেশি ভিতরে গেলে বাঘও পাওয়া যায়। সাহেব কুকুর-দুটোকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে কতকটা নিশ্চিন্ত মনে হাঁটছেন; তিনি ভাবেন নি যে সেখানেই তিনি হঠাৎ বিপদে পড়তে পারেন। তিনি বন্দুক

নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তখন বন্দুকে গুলি ভরা ছিল না। হঠাৎ তিনি এক মস্ত বিপদের সামনে পড়ে গেলেন—একেবারে বাঘের চোখাচোখি! বাঘটা বড় জাতের বাঘ। বাঘের ধরন-ধারণ দেখে বোঝা গেল যে সাহেবকে সে আক্রমণ করতে চায়।

সাহেব বন্দুকে গুলি ভরতে গিয়ে দেখলেন যে বাঘটা তার আগেই তাঁকে আক্রমণ করবে। তিনি ভাবলেন যে, সেদিন বাঘের হাতেই তাঁর মরণ হবে। এমন সময়ে তাঁর সঙ্গের কুকুর-দুটো মহা তেজে বাঘের দিকে ছুটে গেল। তারপর প্রায় দু-মিনিট পর্যন্ত বাঘে আর বাঘা কুকুরে ভয়ানক যুদ্ধ। কুকুর-দুটো প্রাণপণে বাঘটাকে ঠেকিয়ে রেখে লড়াই করছে, যাতে সে কিছুতেই সাহেবের দিকে এগিয়ে যেতে না পারে। তারা খুব জখম হয়ে গিয়েও বাঘের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে! এর মধ্যে সাহেব বন্দুকে গুলি ভরেছেন, কিন্তু গুলি চালালে কুকুরের গায়ে লাগতে পারে, তাই গুলি ছুঁড়তে পারছেন না।

বাঘের সঙ্গে কুকুর আর কতক্ষণ লড়াই করবে? প্রায় দুই মিনিট পরে দুটো কুকুরই মরে গেল, কিন্তু বাঘটাও ততক্ষণে এমন জখম হয়ে পড়েছে যে সে আর তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে না। সাহেব গুলি করে বাঘটাকে মেরে ফেললেন। প্রভুভক্ত কুকুর-দুটো সেদিন সাহেবের প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

বহুরূপী স্কুল

কোন এক গ্রামে আছে মজার ইস্কুল,
একতলা নীল বাড়ি, থামগুলো স্থূল।
পাড়ার ডাক্তার এসে ফটকে বসেন,
মিষ্টি বড়ি ছেলেদের মুখে গুঁজে দেন।
হেড মাস্টার চক্ ডাস্টার এনে দেন ক্লাসে।
রেজিস্টারের খাতা হাতে ইন্‌স্পেক্টর আসে
ছেলেদের মেসো পিসে এসে দলে দলে,
শেখান কতই ভাষা কানে কথা বলে।
দারোয়ান তেড়ে গান শেখায় কতই,
ছেলেদের হয় সেটা মনের মতই।

স্কুলের দপ্তরী এসে ড্রয়িং শেখায়,
এতে সে ওস্তাদ বড়, বেশ বোঝা যায়।
ইস্কুলের সবজান্তা পুরাতন ভৃত্য
বড় পোক্ত দিতে শিক্ষা ব্রতচারী নৃত্য।
ঝাড়ুদার ইস্কুলের ঘড়ি রাখে ঠিক,
তাই দেখে দুষ্টু ছেলে হাসে ফিক্‌ফিক্।
কেরানী-মশাই এসে অঙ্ক দিয়ে যান।
হেড পণ্ডিত হকি খেলে হন হয়রান।
ড্রিল-মাস্টার ঘড়ি দেখে ঘণ্টাটা বাজান,
বড় সুন্দর শব্দ সেটা, শোনো পেতে কান।
ছুটির ঘণ্টাটা শুধু ছেলেরা বাজায়,
এই ঘণ্টা বেশ কিছু আগে বেজে যায়।
ছেলেদের নামগুলো কেমন কেমন,
যত লাগে চেনা-চেনা, অচেনা তেমন।
বাবা চাঁদ, টংলাল, রাজাখাঁ, ঠ্যাঙাড়ে,
চাচাতুয়া, ডিগবাজ, তাজারু, বাঘাড়ে।
এরকম কত নাম নূতন, নূতন,
চেহারাও সাধাসিধা নামেরি মতন।
পুলিসেরা স্কুলে ঢুকে ইতি উতি চায়,
পানের পিকের দাগ ধুয়ে দিয়ে যায়।
পিয়নেরা ইস্কুলেতে আসে চিঠি দিতে,
সুগন্ধ মাখায় সব চিঠিতে চিঠিতে।
ছেলেদের ফুটবল ম্যাচের রেফারী,
জেতাদের খেতে দেন খেজুর সুপারী।
তবু এই ইস্কুলেতে বেশি নাই ফাঁকি,
ভাল ব্যবস্থার কথা রয়ে গেছে বাকী।
হাতের লেখাটা ভাল করেই লেখায়,
ছোট ছোট দরকারী কাজও শেখায়।
পড়াবার ফিকিরটা আছে তলে তলে,
নইলে তো ছেলেগুলো যেত রসাতলে।

চিড়িয়াখানার বাগানে

বিজয়বাবু (বসু) কলকাতার আলিপুরের চিড়িয়াখানার সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট ছিলেন। সেখানকার সব কিছুব দেখা-শোনা করতেন। চিড়িয়াখানার পশু-পাখিরা যাতে ঠিকভাবে খাবার পায়, তাদের অসুখ করলে যাতে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, চিড়িয়াখানার কাজের লোকেরা যাতে ঠিকভাবে কাজ করে, এই সবকিছুই তিনি দেখতেন। সেখানে বাগানের মধ্যে একটা বাড়িতে তিনি থাকতেন। আমরা কয়েকবার তাঁর কাছে গিয়েছি।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে বিজয়বাবু একা একা চিড়িয়াখানার বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। যারা জন্তু-জানোয়ার দেখতে এসেছিল, তারা ততক্ষণে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। তিনি বাগানের যে রাস্তায় বেড়াচ্ছিলেন তার ছ'ধারে গাছপালা আর ছোট ছোট ঝোপ।

বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তাঁর মনে হল যেন কোনো জোয়ান মানুষ পেছন থেকে তাঁর কাঁধের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। ফিরে দেখেন যে সেখানকারই একটা চিতা বাঘ তাঁর কাঁধের উপরে সামনের ছটো থাবা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। সেটা কেমন করে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে বাগানে লুকিয়ে বসেছিল।

বিজয়বাবু বেশ সাহসী মানুষ ছিলেন, তবু তাঁর বুকটা ধড়াস করে উঠল। কিন্তু ভয় পেলে তো আর চলবে না, তাই তিনি মাথা ঠাণ্ডা রেখে বাঘটাকে বশ করবার একটা উপায় তখনি ঠিক করে ফেললেন। তিনি বাঘের গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন, আর বাঘটা আরামে ঘড় ঘড় শব্দ করতে লাগল। বেড়ালেরা আদর পেলে ঐরকম শব্দ করে। চিতা বাঘটা ছেলেবেলা থেকে চিড়িয়াখানার খাঁচাতেই বড় হয়ে উঠেছিল আর বিজয়বাবুকে সে প্রায় প্রত্যেক দিনই খাঁচার ধারে দেখতে পেত।

তিনি অল্পে অল্পে নীচু হয়ে কাঁধ থেকে বাঘের থাবা-ছটোকে মাটিতে নামিয়ে ফেললেন। পরে পকেট থেকে রুমাল বের করে বাঘের গলায় সেটা জড়িয়ে দিলেন। কুকুরকে যেমন গলাবন্ধ বা কলার (Collar) ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, তিনি বাঘটাকেও সেইভাবে নিয়ে যেতে লাগলেন। বাঘটা তো বিজয়বাবুকে চেনে, তাই সে সঙ্গে চলল।

খাঁচার কাছে গিয়ে বিজয়বাবু ভাবলেন যে, বাঘটাকে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয়তো বেশ মুস্কিল হবে, কিন্তু মুস্কিল হল না। বাঘটা নিজেই খাঁচায় ঢুকে গেল। খাঁচাটা তার নিজের বাড়ির মতন হয়ে গিয়েছিল। বিজয়বাবু দেখলেন যে

খাঁচার দরজাটা সেদিন ভাল করে বন্ধ করা হয়নি, তাই বাঘটা বেরিয়ে যেতে পেরেছিল।

কুকুরে-শুয়োরে লড়াই

আমার পিসতুতো ভাই হিতেন্দ্রমোহন বসুর নানারকম কুকুর পুষবার সখ ছিল। কলকাতায় ৫২ নং আমহার্স্ট স্ট্রিটে পিসতুতো ভাইদের বাড়িতে ছেলেবেলায় অনেক রকমের কুকুর দেখেছি। একবার সেই বাড়িতে একটা বেশ বড় রকমের কুকুর রাখা হয়—আইরিশ উল্ফ্-হাউণ্ড (Irish wolf-hound)। সেটা খুব তেজী ছিল, কিন্তু তার চেহারা ছিল বড়ই সুন্দর আর শান্ত। গায়ে আর মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ছেয়ে রঙের লোম, চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল, মুখের ভাব বেশ গম্ভীর আর বুদ্ধিমানের মতন।

নেকড়ের আক্রমণ থেকে ভেড়াদের রক্ষা করবার জন্য আয়ার্ল্যাণ্ডে অনেকে এই কুকুর পোষে। অন্য দেশের লোকেরাও কেউ কেউ সখের জন্য অথবা বাড়ি পাহারা দেবার জন্য এই কুকুর রাখে।

পিসতুতো ভাইদের কুকুরটা বাড়ির ভিতরে উত্তর ধারের উঠোনের পাশে বারান্দায় বাঁধা থাকত। তাকে যখন বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হত, তখন রাস্তার লোকেরা তার চেহারা দেখে অবাক হয়ে যেত। তার গলার আওয়াজ ছিল বেশ নতুন রকমের। সে অন্য কুকুরদের মতন খেউ খেউ বা ঘেউ ঘেউ করত না। বাড়িতে কোনো অচেনা লোক এলে কুকুরটা একবার 'ঘে ঘে ঘে ঘে ঘে ঘে' করে একটানা একটা গর্জন দিয়ে থেমে যেত আর দাঁড়িয়ে উঠে সেই লোকের দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে থাকত। তখন মনে হত যেন একটা সিংহ তাকিয়ে রয়েছে!

ঐ বাড়ির দক্ষিণ পাশে আর একটা বারান্দা ছিল। সেই বারান্দায় দুটো 'বুল টেরিয়ার' কুকুর থাকত—একটা সাদা রঙের বড় বুল টেরিয়ার, আর একটা ছোট কালো বুল টেরিয়ার। ছোট কুকুরটা ভয়ানক রাগী আর তেজী ছিল, আর তার দাঁতগুলো ভয়ানক ধারালো ছিল।

একদিন বাড়ির সামনে রাস্তায় খুব গোলমালের শব্দ শোনা গেল। লোকেরা খুব চেঁচামেচি করছিল, আর কিসের একটা বিচ্ছিরি ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শোনা

যাচ্ছিল। বাইরে গিয়ে দেখা গেল যে একটা শুয়োর ভয়ানক ক্ষেপে গিয়ে লোকদের তাড়া করছে, আর লোকেরা শুয়োরটাকে সামলাতে না পেরে এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করছে। রাস্তায় হৈ হৈ কাণ্ড!

বদ্‌রাগী শুয়োরটাকে জব্দ করবার জন্য পিসতুতো ভাইয়েরা প্রথমে বুল টেরিয়ার কুকুর-দুটোকে রাস্তায় ছেড়ে দিল। কুকুর-দুটো তখন তীরের মতন ছুটে শুয়োরের দিকে এগিয়ে চলল। ছোটো কালো কুকুরটা জোরে ছুটে আগেই গিয়ে শুয়োরকে ধরে ফেলল। এই কুকুরটা ভয়ানক চটপটে ছিল আর অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকগুলো কামড় বসিয়ে দিতে পারত। লড়াই করতে করতে কুকুরটা আর শুয়োরটা একটা স্কুল-বাড়ির বাইরে উঠোনে ঢুকে গেল। স্কুলটার নাম তখন ছিল 'মর্টন' ইন্‌স্টিট্যুশন' পরে 'হিন্দু অ্যাকাডেমি' নাম হয়।

ততক্ষণে পিসতুতো ভাইয়েরা সেই ছেয়ে রঙের প্রকাণ্ড আইরিশ কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়েছে। এই কুকুরটাকে 'রাজা' বলে ডাকা হত। ছাড়া পেয়ে সে ছুটে রাস্তায় গিয়েই সামনের সাদা কুকুরটাকে দেখতে পেল। শুয়োরটা আর কালো কুকুরটা তখন স্কুলের উঠোনে লড়ছে, তাই তাদের দেখা যাচ্ছিল না। 'রাজা' কুকুরটা মনে করল যে সাদা কুকুরটাই বুঝি গোলমালের কারণ; তাই সে তেড়ে গিয়ে সাদা কুকুরের উপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুটোই জবরদস্ত কুকুর, কিন্তু 'রাজার' হাতে পড়ে সাদা কুকুরটা এক মুহূর্তেই কাবু হয়ে পড়ল আর ডিগবাজি খেতে লাগল। এই কেলেঙ্কারী কাণ্ড দেখে পিসতুতো ভাইয়েরা তাড়াতাড়ি গিয়ে কুকুর-দুটোকে ছাড়িয়ে দিল আর বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

ওদিকে স্কুল বাড়িব বাইরের উঠোনে ছোট কালো কুকুরটা ভীষণ তেজে শুয়োরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। চটপটে কুকুরটা শুয়োরের গায়ে কামড়ের পর কামড় বসিয়ে দিচ্ছে, আর শুয়োরটা রেগে আগুন হয়ে কুকুরকে গুঁতিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ একটু সুবিধা পেয়ে শুয়োরটা তার লম্বা লম্বা দাঁত দিয়ে কুকুরকে গুঁতিয়ে দিল। কুকুরটা জখম হয়েও যুদ্ধ চালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু আগের মতো জোর পেল না। শুয়োরটাকে তখন গুলি করে মেরে ফেলা হল।

শুয়োরটা কুকুরের পেটের খানিকটা চামড়া চিরে দিয়েছিল। কুকুরটাকে খুব যত্নের সঙ্গে বাড়িতে এনে চিকিৎসা করা হল। তখন তার একটা মস্ত গুণ দেখা গেল। ডাক্তার যখন কুকুরের পেটে কাটা জায়গায় টিংচার আয়োডিন লাগাচ্ছিলেন তখন সে একটুও চেঁচামেচি করেনি; সে বুঝেছিল যে ওটা ওষুধ। আবার যখন ডাক্তার কুকুরটার কাটা চামড়া সেলাই করে জুড়ে দিচ্ছিলেন তখন সে

বাধা দিচ্ছিল না। সে বুঝেছিল যে তার মঙ্গলের জন্যই ঐরকম করা হচ্ছে। কুকুরটা সেরে উঠেছিল।

বিপদে বন্ধুর কাজ

আমাদের একজন চেনা লোকের ঠাকুরদাদা কলকাতার প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলের এক গ্রামে থাকতেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁর বাগানের বেড়ার ধারে বসে সেটাকে একটু মেরামত করছিলেন। বেশ নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে করতে তিনি হঠাৎ পেছনে একটা খস খস ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনতে পেলেন। সেদিকে একটু মাত্র তাকিয়েই তিনি দেখলেন যে তাঁর পিঠের কাছে একটা বিষাক্ত সাপ ফণা তুলে হেলছে-দুলছে! তিনি যদি উঠবার বা পালাবার চেষ্টা কবেন তবে সাপটা ছোবল মারবে। যদি একটুও নড়া-চড়া বা শব্দ কবেন তাহলেও সাপটা কামড়াতে পাবে।

ভয়ে তাঁর গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তিনি চুপচাপ বসে মনে মনে ভগবানের নাম নিতে লাগলেন। ভাবলেন যে যদি স্থির হয়ে বসে থাকেন তবে সাপটা হয়তো কামড়াবে না, আর যদিই বা পিঠে কি মাথায় কামড়ায় তাহলেও তিনি ভগবানেব নাম করতে করতেই মরবেন।

এইভাবে কিছুটা সময় কাটতেই হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে গেল, যার কথা তিনি আগে ভাবতেই পারেন নি। তাঁর কাছেই একটা প্যাঁচা উড়ে এসে সাপের মাথায় ছোঁ মেরে সেটাকে তুলে নিয়ে উড়ে চলে গেল।

তিনি রক্ষা পেয়ে গেলেন আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। সেই প্যাঁচাকেও তিনি নিশ্চয় মনে মনে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। তাঁর বাড়িব লোকেবা এই অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। প্যাঁচারা সাপ প্রায় ধরেই না। ময়ূর সাপ খায়, আর বাজপাখি সাপ শিকার করে বলে শোনা যায়। এই প্যাঁচাটার হঠাৎ সাপ ধরবার খেয়াল হয়েছিল বলে সেই ঠাকুরদাদার প্রাণ বেঁচে গিয়েছিল। প্যাঁচাটা মস্ত বন্ধুর কাজ করেছিল।

যে বকুল গাছে ঐ প্যাঁচাটা বসেছিল সেই গাছের প্রতিও তাঁর একটা ভাল-বাসা এসে গেল। তিনি সকলকে বললেন, 'এই বকুল গাছটা কেউ কোনদিন কাটবে না।'

সাঁওতালের সরল মন

অনেক বছর আগে মধুপুরে বেড়াতে গিয়ে আমার বাবা উপেন্দ্রকিশোর রায়, আর আমাদের একজন খুব আপনার লোক ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ সেখানকার একটা অচেনা পাহাড় দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমার মেজদাদা সুবিনয় রায়ও গিয়েছিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ সিংহকে আমার মা-বাবা বরাবর খুব স্নেহ করতেন, আর তিনি আমাদের বাড়ির লোকের মতন হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা 'ইন্দ্রনারায়ণ মামা' বলে ডাকতাম। তিনি আমার দাদা-দিদিদের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন।

মধুপুরে গিয়ে বাবা দূরে একটা পাহাড় দেখতে পেতেন। সেটার চেহারা দেখে বাবার সেখানে যাবার খুব ইচ্ছা হত। একদিন তিনি এই নিয়ে ইন্দ্রনারায়ণ মামার সঙ্গে কথা বললেন। দূর থেকে সেই অচেনা পাহাড়ের নতুন রকমের চেহারা দেখে ইন্দ্রনারায়ণ মামারও সেখানে যাবার খুব ইচ্ছা হত। দুজনে পরামর্শ করে সেখানে যাবার একটা দিন ঠিক করলেন।

পাহাড়ে যাবার দিন সকালে তাঁরা আমার মেজদাদা সুবিনয় রায়কে সঙ্গে নিলেন। মেজদাদার বয়স তখন অল্প। মধুপুর এখন রীতিমত একটা শহর, কিন্তু তখন সেখানে ঘর-বাড়ি অনেক কম ছিল। কিছুদূর গিয়েই তাঁরা শহরের বাইরে এসে পড়লেন আর পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললেন।

তাঁরা গল্প করতে করতে যাচ্ছেন আর পথের ধারের নানারকম দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন। মধ্যে মধ্যে উঁচু-নীচু জমি পাচ্ছেন, জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট ঢিপি, কোথাও গাছপালা আর ছোট ছোট জঙ্গল, কোথাও হয়ত মাঠ বা ফাঁকা জায়গা, কোথাও বা মজার মজার খানা-খন্দ। পথে লোকজনের আনাগোনা কম ছিল। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পরেও তাঁরা দেখলেন যে পাহাড়টা যেন তবু বেশ দূরেই রয়েছে। তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে হেঁটে যেতে লাগলেন। পাহাড়টা যেন তাঁদেব টানছিল।

বেলা ক্রমেই বাড়ছিল, আর রোদের তেজও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছিল। তাঁদের সেদিকে ততটা খেয়াল ছিল না। পথ-চলার আনন্দে তাঁরা ওসব অসুবিধার কথা অনেকটা ভুলে গিয়েছিলেন আর তাঁদের মনও রয়েছিল পাহাড়ের দিকে। অনেকখানি পথ পেরিয়ে গিয়ে তাঁরা দেখলেন যে পাহাড়টাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেটা আর তত বেশি দূরে নেই। পরিশ্রম তাঁদের

যথেষ্ট হয়েছিল, পিপাসাও পেয়েছিল, কিন্তু পাহাড়ের সুন্দর তাজা চেহারা দেখে তাঁদের উৎসাহ বেড়ে গেল।

আবার হাঁটা শুরু হল। যেতে যেতে তাঁরা টের পেলেন যে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন আর পিপাসা বেড়ে যাচ্ছে। বাড়ি ফিরবার পথে আবাব অনেক দূর হাঁটতে হবে। তাঁরা পাহাড়ের কতকটা কাছাকাছি অঞ্চলের একটা নির্জন বুনো জায়গায় পৌঁছেছেন বটে, কিন্তু পাহাড়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। সেখান থেকেই পাহাড়েব চেহাবার সঙ্গে যতটা চেনা-পরিচয় হওয়া সম্ভব তা হয়ে গেল, আর তাঁবা সেই নির্জন জায়গার উবড়ো-খাবড়ো পাথর, লালচে জমি, আর বুনো বুনো গাছপালা দেখে নিলেন।

তাঁদের বেশ পিপাসা লেগেছিল। বাড়ি ফিববার আগে জল খেয়ে নিতে পাবলে অনেক সুবিধা হবে, তাই তাঁবা জলের খোঁজ করতে লাগলেন। সেই নির্জন জায়গায় তাঁরা ঘব-বাড়ি বা মানুষ দেখতে পেলেন না। এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ একজন সাঁওতালের দেখা পেলেন। সেই বুনো জায়গায় তাঁদেব তিনজনকে দেখে সাঁওতালটি একটু অবাক হয়ে গেল। তাঁবা তাকে জলের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, 'হাঁ বাবু, আমি তোদের জল খাওয়াতে পারি। আমার সঙ্গে হেঁটে একটু দূরে যেতে হবে, সেখানে আমাব ঘর।' সাঁওতালরা সকলেব সঙ্গে 'তুই', 'তোরা' বলে কথা বলে। ওটা হচ্ছে ওদের আদরের ডাক, ওটা অভদ্রতা নয়।

তাঁরা তাব সঙ্গে সঙ্গে চললেন। সাঁওতালটি খুব সহজ মানুষ আর গরীব। সে সবলভাবেই বলল, 'বাবা, আমি তোদের জল দিব, তোবা আমাকে কিছু পয়সা দিস।' এমন উপকারী গবীব মানুষকে পয়সা দিতে তাঁরা খুসি হয়েই রাজী হলেন।

সাঁওতালের বাড়িটা একটা কুঁড়েঘর। লেখা-পড়া জানা তিনটি লোক আজ তার বাড়িতে জল খেতে এসেছে, এটা তার কাছে এক নতুন রকমের ব্যাপার! সে তাঁদের বল্ল, 'তোরা একটু বিশ্রাম নে; আমি তোদের জন্য ভাল জল এনে দিচ্ছি।' একটু পরে ফিরে এসে সে তাঁদের ভাল জল খেতে দিল আর সুন্দর মিষ্টি গুড় খেতে দিল। তাঁদের শুকনো মুখ দেখে সাঁওতালটি বুঝেছিল যে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, আর পিপাসার সঙ্গে তাঁদের ক্ষিদেও পেয়ে থাকতে পারে। ঐ অবস্থায় শুধু জল খাওয়াটা ঠিক হবে না, তাই সে জলের সঙ্গে গুড়ও খেতে দিয়েছিল।

জল খেয়ে তাঁরা খুবই আরাম পেলেন, আর সেই গুড়ের স্বাদ তাঁদের কাছে একেবারে অমৃতের মতন মনে হল। গরীব সাঁওতালটির সরল প্রাণের আর উঁচু মনের পরিচয় পেয়েও তাঁরা বড় আনন্দ পেলেন। তাঁদের শরীরে আবার জোর ফিরে এল। তাঁরা হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে এলেন। সাঁওতালটির কথা তাঁরা ভোলেননি।

ইস্কুলের গল্প

আমি কলকাতায় সিটি কলেজ স্কুলে ৩০ বছর পড়িয়েছিলাম। মধ্যে মধ্যে স্কুলে বেশ মজার মজার ব্যাপার দেখতে পেতাম। স্কুলের দক্ষিণে স্কুলেরই পাঁচিল-ঘেরা জমিতে ছেলেরা খেলা করত। একদিন দোতলার দক্ষিণের ঘরে শিক্ষক হেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চম শ্রেণীর ছেলেদের পড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ পাড়ার গাছের একটা বাঁদর দক্ষিণের পাঁচিল ডিঙিয়ে হেমদাবাবুর ক্লাসে ঢুকে ভয়ানক রাগ দেখাতে দেখাতে ছেলেদের টপকিয়ে টপকিয়ে বেঞ্চির উপর দিয়ে এগোতে লাগল। বাঁদরের ভয়ঙ্কর তেজ আর বিকট মুখভঙ্গী দেখে ছেলেরা সেটাকে বাধা দিতে সাহস পেল না। তেজীয়ান বাঁদরটা একজন ছেলের কাঁধে চেপে বসে দুই হাতে সেই ছেলের গালে ঠাস ঠাস করে এমন জোরে চড় মারতে লাগল যে ছেলেটি কেঁদেই ফেলল। হেমদাবাবু তাড়াতাড়ি একটা ছাতা হাতে নিয়ে ছুটে এলেন আর বাঁদরটাকে পেটাতে পেটাতে ক্লাস থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

ক্লাসে অনেক ছেলে থাকতে কেন শুধু সেই একজন ছেলের উপরেই বাঁদরটা এত রাগ দেখিয়ে গেল? এই নিয়ে স্কুলে কথাবার্তা হল, আর মোটামুটি বোঝা গেল যে সেই ছেলেটি ঐ বাঁদরটাকে একদিন ঢিল মেরেছিল। বাঁদরটা তখন কিছু করবার সুবিধা পায়নি, তাই পরে ক্লাসে ঢুকে তাকে একটু শিক্ষা দিয়ে গেল।

স্কুলের পাশেই (পশ্চিমে) পুঁটিরাম মোদকের দোকানে ভাল ভাল মিষ্টি, সিঙাড়া, কচুরি, এইসব পাওয়া যায়। পুঁটিরামের রাজভোগ রসগোল্লা বড় চমৎকার। স্কুলের সামনের ফুটপাতে মধ্যে মধ্যে কোথা থেকে একজন মিষ্টিওয়ালা এসে রসগোল্লা বিক্রি করে যেত, কিন্তু সেই রসগোল্লাগুলো ভাল নয়, আর ছাত্রদের সেই বাজে রসগোল্লা খাওয়া মানা ছিল।

একদিন একজন কয়লাওয়ালা একটা কাজে পুঁটিরামের দোকানে ঢুকেছে। তাই দেখে স্কুলের এক ছাত্রের মাথায় হঠাৎ একটা দুষ্টু বুদ্ধি এল। সে ফুটপাথের

ছোট ছোট ঘটনা।

মিষ্টিওয়ালার কাছে একটা বাক্সে রসগোল্লা কিনে নিয়ে পুঁটিরামের দোকানের দরজায় গেল, আর হাতের রসগোল্লাটাকে মহা তেজে ছুঁড়ে কয়লাওয়ালার পিঠে রসগোল্লার গুঁতো বসিয়ে দিল। কয়লাওয়ালা এতে কোন ব্যথা পেল না বটে, কিন্তু রসগোল্লার রসে তার পিঠের একটা বিচ্ছিরি চেহারা হয়ে গেল। এই অদ্ভুত রকমের দুষ্টুমি দেখে লোকেরা তো অবাক্, আর তাদের একটু হাসিও পেয়ে গেল। কয়লাওয়ালার কিন্তু মোটেই হাসি পায়নি। রসে তার পিঠটা চটচট করছিল। সে রেগে-মেগে হাউমাউ করে উঠতেই ছেলেটা পালাতে গেল, কিন্তু ধরা পড়ে গেল।

লোকেরা সেই ছেলেকে স্কুলে নিয়ে এল। মাস্টারমশাইরা ছেলেটিকে ধমক টমক দিয়ে সাবধান করে দিলেন। একজন বললেন, 'কাণ্ডখানা দেখলেন? কয়লাওয়ালার সামনে পুঁটিরামের দোকানের ভাল ভাল দামী রসগোল্লা থাকতে ছেলেটা কিনা রাস্তার লোকের কাছে সস্তা রসগোল্লা কিনে কয়লাওয়ালার পিঠে তাই দিয়ে ঘা বসিয়ে দিল! এতে কয়লাওয়ালার বেশি রাগ হবার কথাই।'

একদিন নবম শ্রেণীর ছাত্রদের বললাম, 'মনে কর একটা ভূতের বাড়িতে দুপুর রাত্রে যদি তোমাদের কাউকে যেতে হয়, তবে মাস্টারমশাইদের মধ্যে কে সঙ্গে গেলে তোমরা বেশী ভরসা পাবে? আমি কয়েকজনের নাম বলছি, তাঁদের মধ্যে শুধু একজনকে সঙ্গে নিতে পারবে। ড্রিল-মাস্টারমশাই, হেডমাস্টারমশাই, পণ্ডিতমশাই, ড্রয়িং টিচার, বিজ্ঞানের মাস্টারমশাই, এঁদের মধ্যে কাকে সঙ্গে নিতে চাও?'

একটি ছাত্র বলল, 'ড্রিল-মাস্টারমশাই সঙ্গে গেলে বেশ হয়, তিনি খুব চটপটে আর সাহসী।' আর একটি ছেলে বলল, 'পণ্ডিত মশাই গেলে মোটেই ভরসা পাব না।' আর একটি ছেলে বলল, 'ড্রয়িং টিচার সঙ্গে গেলেও মন্দ হয় না; তিনি বেশ মোটাসোটা আর সাহসী।' একজন ছাত্র বলল, 'বিজ্ঞানের মাস্টারমশাইয়ের শরীর বড় খারাপ। তিনি ভূতের বাড়ি গিয়ে দরজার বাইরে থেকেই ভূতটাকে বলবেন, 'তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।' এই বলে তিনি নিজেই ফিরে আসবেন।' আর একটি ছেলে বলল, 'হেডমাস্টারমশাই যদি সঙ্গে যান তবে সবচেয়ে ভাল হয়; তিনি ভূতটাকে ইংরাজিতে ধমক দেবেন।' সেই ছাত্রটি মনে করেছে, ইংরাজিতে ধমক দিলে ভূতও জব্দ হয়ে যাবে।

একবার স্কুলে পরীক্ষার সময়ে একটি ছাত্র মাথায় সাবধানে টুপি এঁটে পরীক্ষা দিতে এল। সে নিজের জায়গায় এসে বেশ সোজা হয়ে বসল। খাতা দেওয়া

হলে লিখবার জন্য তাকে একটু নুয়ে পড়তে হল ; মাথা সোজা রেখে লিখতে অসুবিধা হয়। একটু নুয়ে থাকতেই তার টুপিটা ডিগবাজি খেয়ে তার সামনে থপাস করে পড়ে গেল, আর টুপির ভিতর থেকে বই বেরিয়ে এল। বইয়ের একটা ওজন আছে তো ; টুপিটা সে খুব সাবধানে পরেছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ নুয়ে থাকলে বইয়ের ভারে টুপিটা খসে পড়বেই। বই লুকিয়ে রাখবার এই নতুন রকমের বোকামি দেখে অন্য ছাত্রদের হাসি পেয়ে গেল! ছেলেটি তখন থতমত খেয়ে আমতা আমতা করে যা তা বলতে লাগল।

ছেলেটিকে হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি তাকে বললেন, 'বই সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা দিতে বসেছিলে কেন?' ছেলেটি আর কিছু ভেবে না পেয়ে উত্তর দিল, 'আমি পরীক্ষার ঘরের নিয়ম জানতাম না।' হেডমাস্টার-মশাই তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'যা-তা বোঝাতে চাও? নিয়ম যদি না জানতে তবে টুপির মধ্যে গুঁজে বই এনেছিলে কেন? টুপিটা বই রাখবার জায়গা?' ছেলেটিকে কিছু শিক্ষা দিয়ে সাবধান করে দেওয়া হল।

একবার নবম শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্র একটি ছাত্রকে দেখিয়ে বলল, 'এ সেদিন রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে।' ছেলেটিকে স্বপ্নের কথা বলতে বলা হল। সে বলল, 'আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আমাদের বাড়িতে আসছেন। আমি বাড়ির কাছে বাস থামবার জায়গায় গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম; পরমহংসদেব নামলে পরে তাঁকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব। কতকগুলো বাস এসে দাঁড়িয়ে আবার চলে গেল, কিছু কিছু লোকও নেমে গেল, কিন্তু তিনি আর আসেন না। হঠাৎ একটা বাস থেকে পরমহংসদেবের বদলে তাঁর ভাই নামলেন; তিনি আসতে না পারায় তাঁর ভাইকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভাবলাম, ইনি রামকৃষ্ণদেবের ভাই, ইনি এলেও আমাদের আনন্দ। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে বাড়ির দিকে যেতে যেতে বললাম, 'আপনাদের মতন লোক আমাদের বাড়ি যাবেন, সেটা তো আমাদের সৌভাগ্য'। এই শুনে তিনি বলতে লাগলেন, 'কী যে বল তোমরা, কী যে বল তোমরা—।' তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল, তাঁকে আর বাড়িতে আনতে পারলাম না।'

পরমহংসদেবের ভাইয়ের ঐ কথাগুলো কয়েকজন ছাত্রের খুব পছন্দ হল। কিছু নিয়ে তর্ক শুরু হলে অথবা এমনি কথাবার্তার মধ্যেও ওরা সুযোগ পেলেই বলে উঠত, 'কী যে বল তোমরা, কী যে বল তোমরা!'

শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অনেক বছর আগে আমাদের স্কুলে

পড়াতেন। বেশ গম্ভীর স্বভাবের মানুষ ছিলেন, আর সুন্দর পড়াতেন। গোঁফ-দাড়িতে তাঁর চেহারাটা বেশ জাঁদরেল দেখাত। ছাত্রেরা তাঁকে মান্য করত। তখন স্কুলে একটি দুরন্ত ছাত্রও ছিল। তাঁর উৎপাতে অন্য ছেলেরা বিরক্ত হত।

একদিন নিবারণবাবুর ক্লাসে সেই দুরন্ত ছেলেটি কিছু অন্যায় কাজ করাতে নিবারণ বাবু তাকে 'নিলডাউন' হয়ে থাকতে বললেন। প্রত্যেক মাস্টারমশাইয়ের সামনে একটা ডেস্ক (desk) থাকত, নিবারণবাবুর সামনে ছিল। দুরন্ত ছেলেটি সেই ডেস্কের এত কাছে ঘেঁষে হাঁটু গেড়ে বসে রইল যে নিবারণবাবু আর তার পা-দুটো দেখতে পাচ্ছিলেন না, শুধু তার মাথা আর কাঁধ দেখতে পাচ্ছিলেন। ছেলেটির ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যে নীল ডাউন হয়ে থাকতে তার কিছুই অসুবিধা হচ্ছে না, সে বেশ সুখেই আছে। তার এই ভাব দেখে কয়েকটি ছাত্রের মনে কিন্তু কেমন একটা সন্দেহ হল। তারা ভাল করে তাকিয়ে দেখে যে ঐ ছেলেটি পায়ের জুতো-জোড়া খুলে নিয়ে নিজের হাঁটুর তলায় এমন কায়দা করে রেখেছে যে নিল-ডাউন হয়ে থেকেও সে বেশ মজায় রয়েছে, বেশ আরাম পাচ্ছে।

ছাত্রেরা নিবারণবাবুকে ছেলেটির চালাকির কথা বলে দিল। নিবারণবাবু তাকে বললেন, 'অ্যাঁ, চালাকি হচ্ছে? হাঁটু থেকে জুতো সরাও!' ছেলেটির এমন সুন্দর চালাকিটা ফাঁস হয়ে যাওয়াতে সে অপ্রস্তুত হয়ে আস্তে আস্তে জুতো-দুটো হাঁটু থেকে সরিয়ে নিল।

একবার পয়লা এপ্রিলের দিন কয়েকজন ছাত্র তাদের ক্লাসের একটি ছাত্রকে 'এপ্রিল ফুল' বানাতে চাইল, অর্থাৎ কোনো একটা ভুল খবর দিয়ে তাকে বোকা বানাতে চাইল। পয়লা এপ্রিলের দিন কেউ কেউ ঐরকম করে। তারা সেই ছেলেকে শুধু শুধু বলল, 'তুমি কিছু করেছ?—মাস্টারমশাই তোমাকে ডেকেছেন।' ছেলেটি একটু অবাক হয়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে সেই মাস্টারমশাইয়ের কাছে গেল। মাস্টারমশাই কিন্তু বুঝতে পারলেন যে, সেই ছেলেটির বন্ধুরা ওকে এপ্রিল ফুল বানাবার চেষ্টা করছে। ছেলেটি যাতে অপ্রস্তুত না হয় সেজন্য তিনি তাকে বললেন, 'এই যে, এসেছ? কেমন আছ? ভাল তো?' সে তাঁর কথার উত্তর দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ফিরে এল। তার বন্ধুরা দেখল যে তাকে এপ্রিল ফুল বানানো গেল না। মাস্টারমশাই যদি বলতেন, 'কই, আমি তো তোমাকে ডাকিনি' তবে ছেলেটি এপ্রিল ফুল হয়ে যেত।

কয়েকটি ছাত্র কিন্তু একটা নতুন রকমের চালাকি খাটিয়ে তার বন্ধুদের এপ্রিল ফুল বানাতে গেল। তারা বন্ধুদের বলল, 'ইস্কুলের অফিসঘরে একটা শকুনি

ঢুকে হেডক্লার্ক সুবোধবাবুর খাতাপত্রের টেবিলের কাছে চুপচাপ বসে আছে। সুবোধবাবু বলছেন, 'শকুনিটা পোষ মানবে ; এটাকে বাড়ি নিয়ে যাব।' মাস্টার-মশাইরা বলছেন, 'আমরা জোর করে বলতে পারি যে ওটা কিছুতেই পোষ মানবে না ; শকুনি আবার পোষ মানে?' সুবোধবাবু তবু ওটাকে পুষতে চান।' সেই ছেলেদের এই তামাশাটা বেশ জমেছিল। তাদের বন্ধুরা অবিশ্যি কেউ অফিসঘরে ঢুকে শকুনি দেখতে পায়নি ; সেখানে সুবোধবাবু নিশ্চিন্ত মনে অফিসের কাজ করছিলেন।